পৃথিবীর সুখ দুঃখ।

(সাহিত্য পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।)

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত।

—:*:—

প্রকাশক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স।

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

১৩১৫।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

প্রিণ্টার—এ. ব্যানার্জি।

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌।

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌—কলিকাতা।

আমার শেষ কথা

পৃথিবীর সুখ দুঃখ।

বা

রোমন্থক মানব।

আমার বয়স যখন ৩৫ বৎসর, তখন প্রথম আমার চোখের দোষ হয়। দূরে ভাল দেখিতে পাইতাম না। এ দোষকে তখন short sight বলা হইত; এখন near sight বলে। short শব্দের পরিবর্ত্তে near শব্দ ব্যবহার করিয়া কি লাভ হইয়াছে, বুঝিতে পারি না। ইংরাজেরা এখন এইরূপ অনেক পরিবর্ত্তন করিতেছেন, পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা ভিন্ন তাহার অন্য কারণ দেখিতে পাই না—Change for the sake of change—ইংরাজদের একটা রোগ, একটা বাতিক, একটা নেশা হইয়া পড়িয়াছে! চিরকাল তাঁহাদিগকে বলিতে ও লিখিতে দেখিয়াছিলাম—"He did his best",

এখন তাঁহাদিগকে বলিতে ও লিখিতে দেখি—"He did his *level* best"; "*level*" শব্দটা কেন ঢোকানো হইল, বুঝিতে পারি না। আমার প্রিয়তম বন্ধু স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ভাল ইংরাজী জানিতেন, এবং খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর অনেক ইংরাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাই তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"level" শব্দটা জুড়িয়া দেওয়া হইতেছে কেন? তিনি বলিতে পারিলেন না। তাই বলি, আগেকার "short sight" ছাড়িয়া এখনকার "near sight"—এ আর কিছুই বুঝায় না, কেবল ইংরাজের একটা বাতিক বুঝায়। বাতিকের জন্য অনেক ভাল জিনিসও মন্দ হইয়া যায়। দূরে ভাল দেখিতে না পাওয়াকে short sight বলিলে তাহা যেমন পরিষ্কার বুঝায়, near sight বলিলে তেমন পরিষ্কার বুঝায় না। change for the sake of change যাহাদের সংসার-ধর্ম্মের একটা মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সংস্রবে থাকিয়া আমরাও অনেক ভাল জিনিস ছাড়িয়া মন্দ জিনিস ধরিতেছি—আর ঐ বাতিকগ্রস্তদের ন্যায় মনে করিতেছি যে, আমাদের নির্জ্জীবতার পরিবর্ত্তে সজীবতা হইতেছে। আমার short sight হইয়াছিল বটে, কিন্তু তজ্জন্য আমি চসমা লই

নাই। দুই কারণে লই নাই। তখন চস্‌মাধারী দেখিলেই লোকে তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া ধরিয়া লইত। সে রূপে ধৃত হওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না—কেন ছিল না, নাই বা এখন বলিলাম। অপর কারণ এই যে, অনেকে আমাকে বলিয়াছিলেন—ও দোষটা আপনা আপনি সারিয়া যাইবে, চস্‌মা লইলে বোধ হয় সারিবে না। ঔষধে বুঝি উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়, এই ভাবিয়া আমি চস্‌মা লই নাই। চারি পাঁচ বৎসরে দোষটা সত্য সত্যই সারিয়া গিয়াছিল। পরে কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে আর একটা দোষ জন্মিল—নিকটে আর ভাল দেখিতে পাইতাম না। ইহাকে বলে long sight। Long sight হওয়াতে বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। গবর্মেণ্টের কাজ করিয়া দিতে বিলম্ব হইলে তাঁহারা বড় রাগ করেন। ইংরাজ নিজে যেমন ঘোড়ায় জিন দিয়া থাকিতে ভালবাসেন, তাঁহাদের চাকর বাকরেরাও তেমনি ঘোড়ায় জিন দিয়া না থাকিলে তাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠেন। চাকুরী হইতে বিতাড়িত হইবার ভয়ে তখন ডাক্তারদের পরামর্শ লইলাম। তাঁহারা বলিলেন—চোখ strain করা ভাল নয়, আপনি চস্‌মা লউন। আমি চস্‌মা লইলাম। ডাক্তারেরা যখন আমাকে চস্‌মা লইতে বলেন, তখন আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, রাত্রে লেখা পড়া করিবেন না।

এটা বড় চমৎকার উপদেশ। আমাদের দায়ে পড়িয়া লেখা পড়া করিতে হয়, যদি ইচ্ছাসুখে লেখা পড়া করিতে হইত, তাহা হইলে দেখিতে, পৃথিবীতে একটি ছেলেও লেখা পড়া করিত না! আহ্লাদে আটখানা হইয়া আমি রাত্রে লেখা পড়া বন্ধ করিলাম। সন্ধ্যার পরই আমার শয়নগৃহের একধারে একটি ডবল্ বোনা বালান্দা মাদুর পাতিয়া আর একটা তাকিয়া লইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকিতে লাগিলাম। দুই চারি দিন এই রকম পড়িয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মনে নানা কথা ওঠে, উঠিয়া আবার চলিয়া যায়, আবার ওঠে, আবার চলিয়া যায়, যেন শৃঙ্খলাহীন, বন্ধনীহীন, এলো মেলো, কিন্তু বড়ই মোহকর, বড়ই আনন্দজনক। টপ্, টপ্ করিয়া আসে, ফস্ ফস্ করিয়া যায়, কিন্তু যাইয়াও যায় না, আর পাঁচটাকে আনিয়া দেয়। আনিয়া আমাকে জালে জড়ায়। দুই চারি দিনের মধ্যেই ইহাকে চিনিয়া ফেলিলাম—ইহাকে *Reverie* বলিয়া চিনিলাম। ইংরাজ চিনাইয়া না দিলে আমরা এখন আর কিছুই চিনিতে পারি না, আমাদের বেদ বেদান্তগুলাও আর চিনিতে পারি না। তাই ঐ এলো মেলো ব্যাপারটাকে যখন **reverie** বলিলাম, তখন মনে হইল, ওগুলাকে নিজেও চিনিয়াছি, অপরকেও চিনাইয়াছি।

এখন ঐরূপ কথা দু একটি বলি ঃ—এই রকম করিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকিতে থাকিতে এক দিন আমার বাল্যকালের কথা মনে উঠিতে লাগিল। তখন আমার বয়স ৮।১০ বৎসরের বেশী নয়। আমি তখন পাঠশালায় পড়ি, আমার স্বভাব কিছু চঞ্চল, কিন্তু আমি দুষ্ট বা দুরন্ত নই। আমার চঞ্চলতা দেখিয়া আমাদের এক বয়স্ক কুটুম্ব আহ্লাদ করিয়া আমাকে বিচ্ছু বলিয়া ডাকেন। তাহাতে আমি ভারী খুসী। তখন আমার চক্ষু আর এক রকম ছিল কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু এ কথা বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না যে, তখন যাহাই দেখিতাম,—রৌদ্র, জ্যোৎস্না, গাছপালার রঙ, মাটী, মাঠ, ঘাস—যাহাই দেখিতাম, তাহাই যেন এখন হইতে ভিন্ন রকম দেখিতাম—বড় মধুর, বড় মিঠা, বড় বিশুদ্ধ, বড় সুগন্ধ, বড় সরল, বড় নির্দ্দোষ, বড় পবিত্র, বড় সজীব। কিছুতেই মনে অপবিত্র বা আবিলভাব উঠাইয়া দিত না; সকলই আমার মনে একটা কোমল, কলুষ-হীন আনন্দের ভাব তুলিয়া দিত। সে আনন্দের বর্ণনা হয় না, যে অনুভব করিয়াছে, সেই বুঝিতে পারে, সে কি অপূর্ব্ব, কি অনিন্দ্য জিনিস, কত নির্ম্মল, কত শীতল, কত সাদাসিদে। সেই আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে কত বেলা অবধি মাঠে মাঠে কত বেড়াইতাম, দূরে চাষার

গান শুনিতাম, আশে পাশে গরুর হাম্বারব শুনিতাম। বুঝিয়াছি, ব্রহ্মচারীর চক্ষে না দেখিলে বাহ্য প্রকৃতির সে মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন প্রথম যৌবনোদ্গাগ (puberty) হইয়াছিল, এবং সেই জন্য মনে ভোগস্পৃহা জন্মিয়াছিল, তখন হইতে যাহাই দেখিয়াছি, তাহাই বাল্যকালের সেই নির্ম্মলতা, সেই অপূর্ব্বত্ব, সেই পবিত্রতাহীন, সেই সজীবতা শূন্য দেখিয়াছি—তাহা যেন সেই বাল্যদৃস্ট স্বর্গীয় জিনিস নয়। তাহা যেন একটা আবিল জগতের আবিল জিনিস। যাহা নিখিরকিচ ছিল তাহাতে যেন একটা খিরকিচ ঢুকিয়াছে। আবিল পৃথিবীকে চিরকাল নির্ম্মল স্বর্গরূপে অনুভব করিতে হইলে চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হয়। সমস্ত জীবন অসীম আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে সমস্ত জীবন ব্রহ্মচারী থাকিতে হয়, বিধাতার এই বিধান। এই সব ভাবিতে ভাবিতে আবার যেন সেই জন্মস্থানে সেই রকম বালক হইয়া সেই রকম বাল্যলীলায় মত্ত হইয়া ঠিক সেই রকম নির্ম্মল বাল্যানন্দে ভরপূর হইয়াছি—কি সুখ, কি নির্ম্মল, নির্দ্দোষ, ঠাণ্ডা, বিশুদ্ধ সুখ! বাল্যকালের সৌন্দর্য্য বালকে বুঝিতে পারে না, বৃদ্ধে বুঝিতে পারে। বৃদ্ধে যখন বুঝিতে পারে, তখন বাল্যকালের সৌন্দর্য্য আরও সুন্দর হইয়া দাঁড়ায়; কারণ যৌবন ও বার্দ্ধক্যের আবিলতা

অনুভূত হইয়া যাওয়ায়, যাহা নির্ম্মল, যাহা বিশুদ্ধ, তাহার আদর আরও বাড়িয়া যায়, তাহার পবিত্রতা আরও বেশী অনুভূত হয়। তখন বার্দ্ধক্যের রোগ শোক দুঃখ কোথায় চলিয়া যায়, তৎপরিবর্ত্তে সেই আনন্দপূর্ণ বাল্য-কাল আবার আসিয়া পড়ে। সেই সঙ্গে আবার সেই অপূর্ব্ব নির্ম্মল আনন্দের উপভোগ হইতে থাকে। নোনাপোতা, মনসাপোতা, ধনপোতা, চারিদিকে ধান ক্ষেত, মাঝখানে খানিকটা করিয়া উচু জমি, তাহাতে চাষ হইত না, গরু চরিত, আর আমরা খেলা করিতাম। নোনাপোতা আমাদের বাড়ীর অতি নিকটে, ঘরে শুইয়া বসিয়া দেখি-তাম। সেখানে বড় বড় অশ্বত্থ গাছ আছে, নোনা গাছ কখনও দেখি নাই। মধ্যে মধ্যে শুক্না পাতা ঘুরিতে ঘুরিতে উড়িত, আর রাত হইলে আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিত। তাই প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারা বলিতেন, নোনাপোতায় ভূতপ্রেত আছে। আমরাও নোনাপোতার নামে একটু কাঁপিয়া উঠিতাম—তাই ভাবিয়া এখন কত আনন্দ। যে নোনাপোতায় ভূতপ্রেতের বাস, সেই নোনাপোতায় বল্-দেরা তাঁবু ফেলিয়া * দু এক দিন করিয়া বাস করিত। যতক্ষণ তাহারা থাকিত, ততক্ষণ আমরা নোনাপোতাকে

---

* মহামহোপাধ্যায় হইলে লিখিতাম,—'তাঁবু গাড়িয়া'।

ভয় করিতাম না। প্রত্যূষে উঠিয়া গিয়া তাহাদের তাঁবুর ভিতর বসিয়া থাকিতাম। দেখিতাম, এক যায়গার ধান চাল আর এক যায়গায় যাইতেছে; বুঝিতাম না কেন যায়। কিন্তু যাহারা লইয়া যাইত, তাহাদিগকে দেখিয়া, আমরা শিশু, আমাদের ভূতের ভয় পর্য্যন্ত পলাইয়া যাইত। এখন বুঝিয়াছি ক্ষুধার্ত্তের মৃত্যুভয় পলাইয়া যায়। মনে মনে বাসনা হইত, তাহারা যেন ঘন ঘন আমাদের ভূতের ডাঙ্গায় তাঁবু ফেলে। সেই নোনা-পোতায় আমার ভাইপো শ্রীমান সর্ব্বেশচন্দ্র সম্প্রতি একটী হাট বসাইয়া বহু গ্রামের বহু লোকের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন। মনসা-পোতা আমাদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে। শীতকালে প্রায় প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে সেখানে যাইতাম। এবং প্রকাণ্ড হরিদ্বর্ণ মাঠের আইলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে দুই দিকের ধানক্ষেত হইতে ধানের শীষ ছিঁড়িতাম। তাহার পর মনসাপোতায় প্রকাণ্ড হরিদ্বর্ণ মাঠে সূর্য্যাস্ত জনিত প্রকাণ্ড ছায়া, খেঁকশিয়ালের খেলা ও অদূরে বাগ্দীদের ঘরের চাল ভেদ করিয়া ধোঁয়া উঠিতে দেখিয়া কি যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতাম, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না; কিন্তু চক্ষু বুজিয়া এই রকম করিয়া ভাবিতে ভাবিতে এই বৃদ্ধ বয়সে আবার তখনকার

অপেক্ষা অধিকমাত্রায় আনন্দ উপভোগ করি। মনসা-পোতায় গোটা কতক গর্ত্তে খেঁকশিয়ালি থাকিত। আমরা সেখানে গিয়া দেখিতাম, একটা কাঁকড়া মুখে করিয়া, একটা মাছ মুখে করিয়া, বোঁ করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া গর্ত্তে ঢুকিতেছে, তাই দেখিয়া আমরা হাততালি দিয়া উঠিতাম। ধনপোতা মনসাপোতার খানিক দক্ষিণে। উহার নিকটে মানুষের বাস দেখা যাইত না, সেখানে যাইতে গাটা যেন একটু ছম্ ছম্ করিত। একদিন একলা গিয়াছিলাম, বড় ভয় করিয়াছিল। তবু কিন্তু কতকগুলা লাল কুঁচ তুলিয়া আনিয়াছিলাম। লাল কুঁচ দেখিলে এখন ভয় করে। অনুজ অক্ষয়চন্দ্রের একটি ছেলে আমার দেওঘরের বাসায় একটি কথা বলিয়াছিল, সেই কথাটি মনে পড়ে, আর ভয় করে। সে কথাটি এই, "রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা, এ হেন সুন্দরী বনে কেন দেখা?" রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা, একি সেই Lady Macbeth না কি? আমি তবে ভারি দুঃসাহসিক, একলা Lady Macbeth—পোতায় গিয়াছিলাম! তখন Lady Macbeth—পোতায় গিয়া ভয় হইয়াছিল, সেই কথা ভাবিতে এখন আনন্দের সীমা থাকে না। মানুষের জীবন সত্য সত্যই আনন্দময়। আর একটা আনন্দের কথা বলি। সেই পূজার আনন্দ ঃ—

৭ই আশ্বিন সপ্তমীপূজা। ৪ঠা আশ্বিন ইস্কুল করিয়া ছুটী হইবে। আমরা ৫ই আশ্বিন বাড়ী যাইব। ৫ই আশ্বিনের জন্য আমরা ধড়ফড় করিতেছি। আজ ২৯ এ শ্রাবণ। আমরা সাতটী সমবয়স্ক ছেলে এক বাড়ীতে থাকিতাম। আমার অগ্রজ দ্বারকানাথ, আমার দুই ভাইপো প্রিয়নাথ ও অঘোরনাথ, আমার জাঠতুত ভাই উমেশচন্দ্র, আমার মাসতুত ভাই রাধিকাপ্রসাদ, এবং আমার জাটতুত ভাই বৃন্দাবনচন্দ্রের কনিষ্ঠ শ্যালক বৈদ্য-বাটী নিবাসী গিরিশচন্দ্র মিত্র। দ্বারকানাথ, প্রিয়নাথ, অঘোরনাথ ও উমেশচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। আছি কেবল আমি, রাধিকা, এবং গিরিশ ভায়া। কর্ত্তারা আমাদিগকে রাত্রি নয়টার সময় শুইবার অনুমতি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরদিনের পড়া যতক্ষণ না নিখুঁতরূপে আয়ত্ত হইত, ততক্ষণ আমরা শুইতাম না। শুইতে কোন দিন ১০টা, কোন দিন ১১টা, কোন দিন ১২টা বাজিয়া যাইত। তথাপি পূজা যখন নিকটবর্ত্তী হইত, তখন আমরা কয় জনে সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে উঠিয়া একত্র হইতাম, এবং বাড়ী যাইবার আর ৩৫ দিন আছে, এই বলিয়া গা-টেপা-টিপি করিতাম, আর একটু চাপা রকম খিল্ খিল্ও করি-তাম। তাহার পর দিন আবার তেমনি করিয়া একত্র হইয়া বলিতাম, আর ৩৪ দিন আছে, আর গা-টেপা-

টিপি ও খিল্ খিল্ করিতাম। এইরূপে যখন ৪ঠা আশ্বিন আসিত তখন আবার সূর্য্যোদয়ের ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে উঠিয়া তেমনি একত্র হইয়া “কাল হে কাল” মহোল্লাসে এই কথা বলিতাম, আর শব্দ না হয় এমনি করিয়া নাচিতাম, কারণ, কর্ত্তরা তখনও নিদ্রিত। এই সব কথা মনে উঠিলে ঠিক সেই সময়ে গিয়া পড়িতাম, দ্বারকানাথ, প্রিয়নাথ, অঘোরনাথ ও উমেশচন্দ্র, যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যেন আবার সশরীরে ফিরিয়া আসিতেন, আর সকলে জড়াজড়ি করিয়া “কাল হে কাল” বলিয়া আবার সেইরূপ উল্লাস উপভোগ করিতাম। এইরূপ পূর্ব্ব কথা মনে উঠিলে, পূর্ব্বের সেই আনন্দ ও উল্লাসও যেন শরীর প্রাপ্ত হইয়া মনের ভিতর আসিত, বৃদ্ধ বয়সে আবার ঠিক সেইরূপ বালক হইয়া বাল্যকালের সেই নির্ম্মল শরীরী আনন্দ ও উল্লাস প্রত্যক্ষ করিয়া অসীম আনন্দ ও উল্লাস উপভোগ করিতাম। আজ ৫ই আশ্বিন আজ বাড়ী যাইব। কেমন আহ্লাদ করিতে করিতে যাইতাম, Oriental Miscellany নামক একখানি ইংরাজী মাসিক-পত্রে একবার লিখিয়াছিলাম। সেই লেখাটুকু প্রথম ক্রোড়পত্রে তুলিয়া দিলাম। পূজার সময় বাড়ী যাইবার যে এত আনন্দ, তাহা কার্ত্তিকের জন্য ভাল পাগড়ি কিনিয়া লইয়া যাইতাম বলিয়া কত যে বাড়িয়া যাইত, তাহা আর

কি বলিব! ইস্কুলে জল খাইবার জন্য যে পয়সা পাইতাম, তাহাই বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া কার্ত্তিকের জন্য ভাল পাগড়ি এবং আটচালায় জ্বালাইবার জন্য একটি লণ্ঠন কিনিয়া লইয়া যাইতাম। কর্ত্তাদের প্রতিমার সাজসজ্জার দিকে বেশী দৃষ্টি ছিল না, তাঁহাদের বেশী দৃষ্টি ছিল কাঙ্গালী বিদায়ের দিকে, এবং লোকজনের ভোজনের দিকে। আমরা তখন বালক, প্রতিমার সাজ সজ্জা ভাল হয়, আমাদের তখন বড় ইচ্ছা, তাই আমরা আপন হাতে প্রতিমা সাজাইতাম, এবং কার্ত্তিকের জন্য ভাল পাগড়ি কিনিয়া লইয়া যাইতাম। আর কর্ত্তাদের বাহারের দিকে দৃষ্টি ছিল না বলিয়া আমাদের তত বড় আটচালায় চারিটির বেশী বড় লণ্ঠন জ্বলিত না। সেটা আমাদের ভাল লাগিত না। তাই আমরা প্রতিবৎসর একটা করিয়া ছোট লণ্ঠন কিনিয়া লইয়া যাইতাম। আর সেই লণ্ঠনটি যখন জ্বলিত, তখন ভাবিতাম, আমাদের খুদে লণ্ঠনটি সরকারী বড় বড় লণ্ঠনগুলির চেয়েও বড়। এই সব করিয়াও যে ক্ষোভটুকু থাকিত, তাহা মিটাইবার জন্য সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী, চারি দিন খুব ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়া আটচালায় সমস্ত নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতাম। এইরূপে আমরা volunteerএর কাজ করিতাম। এ কাজ করিয়া যে পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতাম, তাহার বর্ণনা হয় না,

কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও এই রকম করিয়া আবার অনুভব করিয়াছি। বিধাতার কি অপূর্ব্ব মঙ্গলময় বিধান! তিনি বুড়ো মানুষকেও বালক করিয়া বাল্যকালের নির্ম্মল পবিত্র আনন্দের অধিকারী করেন! কয়দিনই সন্ধ্যার আরতি হইয়া গেলে, আমরা মহা আনন্দে আটচালায় নাচিতাম। আর গাহিতাম ঃ—ষড়ানন ভাই, তোর কেন নবাবী এত, তোর ঘরে নাইক অন্টরম্ভা, পরের বাড়ী কোঁচা লম্বা, তোর মা সেই জগদম্বা, পেটের জ্বালায় ছাগল খেত। ঢুলি নাচের বাজনা বাজাইত, আর আমরা নাচিতাম। চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে ঠিক সেই নাচ নাচি, এবং ঠিক সেই আনন্দ অনুভব করি। হায়! দেশের কি দুর্ভাগ্য! এখনকার বালকে বুড়োরমত হইয়াছে, লজ্জায় ও গাম্ভীর্য্যে এক কিম্ভূতকিমাকার জীব। যাহাদের বালকে আনন্দ ও উল্লাস করিতে পারে না, তাহাদের মঙ্গল হওয়া কি সম্ভব? তখন বুড়াতেও বালকের ন্যায় আনন্দ করিত। আমাদের সেই পরাণ জেঠা বয়সে প্রায় সত্তর; কিন্তু আনন্দে উল্লাসে আমাদের সঙ্গে নাচিতে ঠিক আমাদেরই মতন বালক। নবমীর বলিদানের পর যে কাদামাটী হইত পরাণ জেঠাই ত তাহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। নিজে কলসী কলসী জল ঢালিয়া নিজে প্রথমে গড়াগড়ি আরম্ভ করিতেন। আমরা অমনি নাচিয়া উঠি-

তাম। ১০।১৫ জনে গড়াগড়ি আরম্ভ করিতাম, সর্ব্বাঙ্গে কাদা, সেই কাদা-মাখা গায়ে পরাণ জেঠার সঙ্গে পাড়ার অন্য অন্য পূজাবাড়ীতে গিয়া সেখানে আবার কাদামাটী করিতাম, আমাদের ঢাক ঢোল আমাদের সঙ্গে যাইত। ক্রমে অন্যান্য বাড়ীর ঢাক ঢোলও আমাদের সঙ্গ লইত। যখন শেষ বাড়ীতে কাদামাটী করিয়া নাচিতে নাচিতে পুকুরে নাইতে যাইতাম তখন ঢাক ঢোলের শব্দে দশ-খানা গ্রাম কাঁপিয়া উঠিত, দশখানা গ্রামের লোক ছুটিয়া দেখিতে আসিত। তখন আমাদের বড়পুকুরে ঝপাং ঝপাং করিয়া পড়িয়া পুকুর তোলপাড় করিতাম ও গাবাইয়া তুলিতাম। সেই সেকালের উল্লাস, কিন্তু বুড়ো বয়সে এই রকম করিয়া চক্ষু বুজিয়া যেন শরীরীবৎ আবার দেখিয়াছি, দেখিয়া তাহার সহিত আবার সেই তখনকার মতন মাতামাতি করিয়াছি। মানুষের সুখের সীমা আছে কি? মানুষের সুখের ভাণ্ডার ফুরাইবার নয়। সকলেরই জীবনে, :বিশেষ বাল্যকালে, এইরূপ আনন্দোপভোগ হইয়া থাকে। বুড়া হইয়া সকলেই যদি আমার মতন চক্ষু বুজিয়া সেই বাল্যানন্দের ছবি মনে ফলাইয়া তোলেন, সকলকেই স্বীকার করিতে হয় যে, কৃপাময় ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে পৃথিবীতে সকলেরই সুখের ভাণ্ডার যথার্থই অসীম অনন্ত অফুরন্ত।

লোকে যে এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, পৃথিবীতে সুখ নাই,

"অনেক দুঃখ আছে হেথা, এ জগৎ যে দুঃখে ভরা",

এ কেবল কুশিক্ষা, কুদৃষ্টান্ত এবং ঈশ্বরপরায়ণতার অভাবের ফলে বলিতেছে। ঐ যে ইংরাজ কবি বলিয়াছেন,—

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought—

ওটা এখনকার ইউরোপের একটা ঢং; সুতরাং ইংরাজীওয়ালা বাঙ্গালীর বড় ভাল লাগে, এবং ইংরাজীওয়ালা বাঙ্গালীর বাঙ্গালা সাহিত্যে এত প্রবল এবং আদৃত হইতেছে। তা নয়, তা নয়; এই বুড়ো বয়সেই বাল্যকালের অসীম, নির্ম্মল আনন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া আমি জোর করিয়া বলিতেছি—এ জগৎ সুখে ভরা, মানুষের সুখের পরিমাণ হয় না—ভগবানের দয়া ও কৃপা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বৃদ্ধ বয়সে আমার বর্ণিত প্রণালীতে বাল্যকালকে মূর্ত্তিমান করিয়া বাল্যানন্দ প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। কাজ অতি সহজ। চক্ষু বুজিয়া ধ্যানস্থ হইলে ভগবানেরই নিয়মে অতি সহজে সম্পন্ন হয়।

পূজার কথা ভাবিতে ভাবিতে, সন্ধিপূজার ভীষণতা-

পূর্ণ আনন্দের কথা মনে উঠিল। গভীর রাত্রে সন্ধিপূজা না হইলে আমাদের মন খারাপ হইত। গভীর রাত্রে হইলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। সন্ধিবলিদান একটা বিষম ব্যাপার। ঠিক মুহূর্ত্তে না হইলে মায়ের পূজা একরকম পণ্ড হয়, গৃহস্থের ঘোর অনিষ্টের সম্ভাবনা। মুহূর্ত্ত-মাহাত্ম্য সকল মহৎ কাজেই আছে; কিন্তু আমাদের সন্ধিপূজায় যেমন দেখিয়াছি, আর কিছুতেই তেমন দেখি নাই। একটু বলি ঃ—

সন্ধিপূজা ও বলিদান আমাদের দুর্গাপূজার সর্ব্বপ্রধান অংশ। আজ রাত্রে সন্ধিপূজা ও বলিদান। সকাল হইতে মেয়ে পুরুষ, পাড়া প্রতিবেশী সকলেরই মুখে কেবল ঐ কথা—সকলেই যেন ভীত সন্ত্রস্ত। সন্ধ্যার সময় তাঁবি বসিল। সেটা কি, বোধ হয় অনেকে জানেন না। যখন ঘড়ি ছিল না, তখন সন্ধিপূজা ও বলিদানের মুহূর্ত্ত নিরূপণ করিবার জন্য তাঁবি পাতা হইত। ঘড়ির চলন হইলেও, পুরাতন বুনিয়াদি বাড়ীতে তাঁবি পাতা হইত। আমাদের বাড়ীতে এখনও পাতা হয়। আমাদের পাড়ার আচার্য্যেরা চিরকাল আমাদের বাড়ীতে তাঁবি পাতিতেছেন। এখনও তাঁহাদেরই এক জন পাতেন। ঠিক সূর্য্যাস্তের সময়, বৈঠকখানায় একটা নূতন হাঁড়িতে এক হাঁড়ি জল বসান হয়। একটি পাতলা তামার বাটির

তলায় এমন একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে যে, বাটিটি হাঁড়ির জলের উপর বসাইয়া দিলে যতক্ষণে জলপূর্ণ হইয়া ডুবিয়া যায়, ততক্ষণে ১ দণ্ড হয়। ডুবিবামাত্র উহা তুলিয়া আবার বসাইতে হয়। উহা যতবার ডোবে, হাঁড়ির গায়ে ততবার এক একটি চূণের দাগ দিতে হয়। তাহাতে দণ্ডের সংখ্যা ঠিক থাকে। রাত্রি যত দণ্ড হইলে সন্ধিপূজা আরম্ভ হয়, হাঁড়ির গায়ে ততগুলি চূণের দাগ পড়িলেই পূজারী মহাশয়কে চেঁচাইয়া বলা হয়, মহাশয়, এতবার তাঁবি পড়িয়াছে। সন্ধিপূজা আরম্ভ হইবে শুনিলে, আমি তাঁবির জায়গা ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধিপূজার মন্ত্র শুনিতে যাইতাম। চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া দেখিতাম, বন্ধুগোষ্ঠীর সমস্ত স্ত্রীলোক সেখানে গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, চণ্ডীমণ্ডপ ধূনার ধোঁয়াতে পরিপূর্ণ, মাকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, আর চণ্ডীমণ্ডপে ৺কালীপূজার দীপান্বিতার ন্যায় অসংখ্য দুর্গাপ্রদীপ জ্বলিতেছে—কারণ, সন্ধিপূজায় মায়ের চামুণ্ডারূপে পূজা করা হয়,—বড় শক্ত পূজা, সেই ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের মধ্যে, দুই একটি নয়, কোটী যোগিনীর পূজাও শেষ করিতে হয়, আর সন্ধিবলিদানের সময় মহিষের শৃঙ্গোপরি রক্ষিত সরিষা যতটুকু সময় থাকে, ততটুকু সময়ের জন্য মায়ের একবার আবির্ভাব হয়, এবং সেই আবির্ভাবকালের

মধ্যে যাহাতে সন্ধিবলিদান হয়, তাহাও করিতে হয়। বড় ভয়ানক, বড় শক্ত পূজা! ঐ যে মহিষের শৃঙ্গের উপর সরিষার কথা, ওটা অতুলনীয় কবিকৌশল। সেই ভীষণ পূজার দুই একটা মন্ত্র শুনুন; শুনিলে বুঝিবেন, এ পূজার কল্পনা যাহাদের মনে উদিত হইয়াছিল, সংসারে তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই, অন্ততঃ অসাধ্য হওয়া উচিত নয়। এমন ভীষণতা যাহাদের এত প্রিয়, এত মনের ও হৃদয়ের সামগ্রী, তাহাদের কিছুতেই ভীত ত্রস্ত হওয়া উচিত নয়; তাহারা ভীত ত্রস্ত হইলে বুঝিতে হয়, তাহাদের সারবত্তা ফুরাইয়াছে তাহারা মরিয়া গিয়াছে। এত স্ত্রী ও পুরুষ, কিন্তু কাহারও মুখে কথাটি নাই, এমন কি, চপল চঞ্চল বালকেরা পর্য্যন্ত নির্ব্বাক নিস্তব্ধ, আমি যেন সে বিচ্চু নই, সে বালক নই, রোমাঞ্চিত হইয়াছি; ঢাকী ঢুলী ঢাক ঢোল ঘাড়ে করিয়া তাহাদের সেই এক-চালাখানি ছাড়িয়া আটচালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা থাকিয়া থাকিয়া "মা গো" "মা গো" শব্দ করিতেছেন, ইংরাজীওয়ালারা পর্য্যন্ত তাকিয়া, সট্কা ছাড়িয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছেন, ধূনার ধোঁয়ায় আট-চালা পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়াছে, আমি কাঁপিয়া উঠিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়াছি, এমন সময়ে যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভীত ত্রস্ত করিয়া তন্ত্রধারক ঘোষাল মহাশয় মন্ত্রপাঠ করিলেন:—

জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্।
সুচারুদশনাং তদ্বৎপীনোন্নতপয়োধরাম্!
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্॥
মৃণালায়তসংস্পর্শ-দশবাহুসমন্বিতাম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ।
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতম্॥
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননম্॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥
অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সমস্তাৎ পরিবেষ্টিতাম্॥
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥

ইহা দুর্গাপূজা নয়, কালীপূজা নয়, ইহা চামুণ্ডার পূজা—যে মূর্ত্তিতে মা অসুর নাশ করেন, ইহা মায়ের সেই চামুণ্ডামূর্ত্তি। এ মূর্ত্তির ধারণা আমাদের আর হয় না—ভীষণতা যতদিন আমরা এমনই করিয়া আবার ভোগ করিতে না পারিব, ভীষণতায় যতদিন আবার এমনই করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতে না পারিব, ততদিন আমাদের এ মূর্ত্তির ধারণা আর হইতে পারিবেও না। আমরা এখন বছর বছর শক্তি, আদ্যাশক্তির পূজার কথা কহিয়া থাকি, কিন্তু সে কেবল ফাঁকা কথা। আদ্যা-শক্তির মর্ম্ম আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, ভুলিয়া গিয়া আমরা বেজায় মোলায়েম হইয়া পড়িয়াছি, মোলায়েম হইয়া আমরা আর কষ্ট সহিতে পারি না, সুতরাং কঠোর হইতেও পারি না। তাই আজ পিতৃমাতৃ-বিয়োগে এক মাস কাল কষ্টকর অশৌচ পালন করিতে অশক্ত ও অনিচ্ছুক বলিয়া সভা করিয়া পৈতা লইয়া ক্ষত্রিয় ভাণ করিয়া অশৌচকাল কমাইয়া ১২ দিন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। তাই আমরা ভীষণতা দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দে ভরপূর না হইয়া ভীত ত্রস্ত হই—বলিয়া থাকি, ও ছাগবলি বন্ধ কর, ও রক্তপাত বড় নিষ্ঠুরতা। আরে দেবার্চ্চনায় রক্তপাত যদি নিষ্ঠুরতা তবে উদরার্চ্চনার জন্য রক্তপাতে নিষ্ঠুরতা দেখনা কেন? যাঁহারা এই

ভীষণ পূজার কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের করুণা কোমলতার কথা এখনি বলিব, শুনিও।

সন্ধিপূজা শেষ হইলেই দেখিলাম, আটচালায় হাড়িকাঠ পোঁতা হইয়াছে, বৃদ্ধ কালী কামার স্নান করিয়া ছাগল নাওয়াইয়া আনিয়া মায়ের সম্মুখে উপস্থিত। আমি অমনই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নদীর ধারে গেলাম। আমাদের বাড়ীর পূর্ব্ব দিকেই কৌশিকী নদী। আমরা ৪।৫ জনে সেই নদীর ধারে গিয়া বসিলাম। ঘড়ি দেখিয়াও সন্তুষ্ট নয়, তাঁবি পাতিয়াও সন্তুষ্ট নয়, শুনিতে হইবে হরিপালের রায়েদের বাড়ীর বন্দুকের শব্দ! সেখানে যেমন সন্ধিবলিদানের কোপ হয়, চিরকাল অমনই বন্দুক ছোঁড়া হয়। যেমন বন্দুকের শব্দ শুনা, অমনই চেঁচাইয়া বলা—বন্দুক হইয়াছে। অমনই পুরোহিত হাড়িকাঠ পূজা করিলেন—কর্ত্তারা তন্ত্রধারক ঘোষাল মহাশয়ের অনুমতি চাহিলেন—ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—হাঁ, ঠিক সময় হইয়াছে, অষ্টমী দণ্ড কাটিয়াছে। অমনই মা মা শব্দে সেই ভীষণতা ভীষণতর হইয়া উঠিল। ঈশ্বর দাদা ও কানাই জেঠার বাড়ীর লোক সেই সংবাদ লইয়া ছুটিল। খুঁটি ছাড়, খুঁটি ছাড় শব্দ উঠিল; বৃদ্ধ কালো কামার সেই বৃহৎ খাঁড়া তুলিয়া কোপ করিল—বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল—যে সকল

বাড়ীতে পূজা, সর্ব্বত্রই সন্ধিবলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল। ঘর দ্বার গাছপালা পথঘাট স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা—সমস্ত গ্রাম যেন কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে যে সন্ধিবলিদান হইয়া গেল, ইহাতে সমস্ত গ্রাম আনন্দে ভরপূর হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এমন তন্ন তন্ন করিয়া যাঁহারা ভীষণতার সাধনা করিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালী হইলেও তাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত মানুষ, মনুষ্যমধ্যে যথার্থ আর্য্য। ভীষণতা লইয়া যে খেলা করিতে ভালবাসে সেই পৃথিবী লাভ করে—প্রকৃত মানুষ হয়। আটলাণ্টিকরূপ ভীষণতার সহিত খেলা করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই ইউরোপ আমেরিকার অন্নভাণ্ডার লাভ করিয়াছে। আর উত্তমাশা অন্তরীপের ভীষণতার সহিত খেলা করিতে পারিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ড ভারতের স্বর্ণভাণ্ডার লাভ করিয়াছে। তান্ত্রিক সাধক ভীষণতা লইয়া খেলা করে বলিয়া সাধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—মানুষের মধ্যে jelly নয়, লৌহদণ্ডবৎ কঠিন ও শক্ত। ধ্রুব ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। তাই বিধাতার নিকট হইতে ধ্রুবলোক আদায় করিতে পারিয়াছিলেন। তান্ত্রিকের শবসাধনাদি বড় ভীষণ সাধনা। বোধ হয়, প্রহ্লাদও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তেমন অষ্টে পৃষ্ঠে দড়—জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, বিষ খাইয়া

হজম করে, হাতীর পদভরে ভাঙ্গে না— তান্ত্রিক সাধক না হইলে হইতে পারে কি? ভবানীর বরপুত্র ছত্রপতি শিবজী তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। আমরা jelly হইয়া পড়িয়াছি—তাই কষ্ট দেখিলে কাতর হইয়া পড়ি, কঠোরতাকে বর্ব্বরতা বলি, আর কঠিন কাজে পশ্চাৎ-পদ হই। আমাদের দুর্গোৎসব, দুর্গোৎসব নয়, আমাদের দুর্গোৎসব পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য—**Iliad** অপেক্ষা বড়, **Æneid** অপেক্ষা বড়, **Paradise Lost** অপেক্ষা বড়, **Inferno** অপেক্ষা বড়, **Jerusalem Delivered** অপেক্ষা বড়। এই মহাকাব্য যাহাদের হৃদয়োদ্ভূত, আমরা তাহাদের উপযুক্ত বংশধর নহি। যদি জগতে আবার উঠিতে হয় আমাদিগকে তান্ত্রিক সাধক হইতে হইবে—তান্ত্রিক সাধনায় ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে। সে সাধনায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বাড়ে, ওটা বড় ভুল কথা। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্যই সে সাধনা। আমরা বড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াছি। তাই আমাদের তান্ত্রিক সাধনার প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদিগকে লোহার সমান কঠিন হইতে হইবে।

আবার ভোরে বাজনা শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিল—অমনই প্রাণ যেন কাঁপিয়া উঠিল—আজ যে বিজয়া দশমী—মা আজ বাড়ী যাবেন। স্নান করিয়া নৈবেদ্য করিয়া দিলাম। কিন্তু আজ নৈবেদ্যের সংখ্যা অল্প, প্রধান

নৈবেদ্য একেবারেই নাই---মন বড় খারাপ ; আনন্দের পরিবর্ত্তে আজ ঘোর নিরানন্দ---কিন্তু বড় আনন্দময় নিরানন্দ। আনন্দময়ী তিন দিন---তিন দিন কেন---তিন মাসের অধিক আনন্দ দান করিয়া বাড়ী যাই-বেন বলিয়া আজ আনন্দময় নিরানন্দ---আনন্দাত্মক বিষাদ। চণ্ডীমণ্ডপে দর্পণ বিসর্জ্জন আরম্ভ হইল। স্ত্রীলোকেরা আজ মলিন বস্ত্র পরিয়া গলায় কাপড় দিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। কর্ত্তারা বৈঠকখানা ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়াছেন---আটচালায় অসংখ্য গ্রামবাসী গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তন্ত্রধারক ঘোষাল মহা-শয় মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। ঘোষাল মহাশয়ের গলা বড় মিষ্ট ছিল, এবং অনুরাগভরে কথা কহিলে সে গলা একটু কাঁপিত। সেই মিষ্ট গলায় ঈষৎকম্পিত স্বরে ঘোষাল মহাশয় মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন ঃ---

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি।
সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ॥

মন্ত্র শুনিয়া সকলেরই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। সকলেই ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কচি মেয়েটি বিবাহের পর দিন যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন বিবাহবাড়ীতে কেবলই যেমন ফোঁস ফোঁসানি, আজ

বিজয়া দশমীর দিন বাঙ্গালীর বাড়ীতে তেমনই কেবলই ফোঁস ফোঁসানি। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা তো আমাদের দেবী নহেন, আমাদের ঘরের মেয়ে, আমাদের সতীসাধ্বীদের গর্ভেরসন্তান। তাই ত আজ বৈকালের সেই অপূর্ব্ব, অননু-ভবনীয়, অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয় ব্যাপার। মায়ের প্রতিমা নদীতে নিক্ষেপ করিবার সময় হইয়াছে। প্রতিমাচণ্ডীমণ্ডপ হইতে আটচালায় নামান হইয়াছে। পুরুষেরা বাটীর বাহিরে গিয়াছেন—ঢাকী ঢুলী বাটীর বাহিরে গিয়া বিসর্জ্জনের বাজনা আরম্ভ করিয়াছে। সদরদরজা বন্ধ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা মাকে বরণ করিতে আসিয়াছেন। জলের ঝারা দিয়া তাঁহারা প্রতিমা প্রদ-ক্ষিণ করিলেন। তাহার পর মাকে বরণ করিলেন। তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের, লক্ষ্মীঠাকুরাণীর, সরস্বতীর, গণেশের, কার্ত্তিকের, সিংহবাহিনীর সিংহের, মায়ের বর্শাবিদ্ধ অসুরের পর্য্যন্ত মুখে সন্দেশ গুঁড়া করিয়া এবং ছেঁচাপান টিপিয়া টিপিয়া দিলেন, এবং প্রত্যেককে মাথার দিব্য দিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে আবার আসিতে বলিলেন, সর্ব্বশেষে আপন আপন বস্ত্রাঞ্চলে সিংহটি অসুরটির পর্য্যন্ত প্রত্যেকের পদধূলি পরম পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলেন—তাহার পর আবার কাঁদিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে আমার মা

প্রতিমার পিছনে দাঁড়াইয়া বস্ত্রাঞ্চল পাতিলেন, আমার পিতা সম্মুখ দিক হইতে তাহাতে কনকাঞ্জলি অর্থাৎ থালা শুদ্ধ চাল ও টাকা ফেলিয়া দিলেন। তখন পুরুষেরা প্রতিমা নদীতীরে লইয়া গেলেন। আচার্য্যদিগের নদীতে চিরকাল আমাদের প্রতিমা বিসর্জ্জন হয়। সেই নদীতীরে প্রতিমা বসান হইল। অনেকক্ষণ রাখা হইল। কারণ নদীর অপর পারে অনেক স্ত্রীলোক মাকে দেখিবেন বলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাও কাঁদিতেছেন। তাহার পর প্রতিমা নদীর জলে নিমজ্জিত হইল। আমরা বালক—দুই একখানা ডাক খুলিয়া লইলাম। তাহার পর ঢাকী ঢুলী সঙ্গে লইয়া নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে যাওয়া হইল। ঢাক ঢোল কিন্তু বাজিতেছে না। প্রতিবৎসরই নীলকণ্ঠ পাখী দেখিয়া তবে বাড়ী ফেরা হয়। চিরকাল শুনা আছে যে, বিসর্জ্জনের পর মহাদেব নীলকণ্ঠ পাখীর রূপ ধারণ করিয়া একবার দেখা দিতে আসেন। প্রতি বৎসরই বাগ্দীপাড়ায় একটা নয় আর একটা গাছে নীলকণ্ঠ পাখী দেখিয়াছি। দেখিতে পাওয়া গেলেই ঢাক ঢোল বাজিয়া ওঠে, আর পাখী উড়িয়া যায়। সকলে পাখীকে প্রণাম করিয়া বাড়ীতে ফিরি। বাড়ীতে ঢুকিয়া চণ্ডীমণ্ডপ শূন্য দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু তখনই আবার আহ্লাদে বুক

নাচিয়া উঠে। সে কিসের আহ্লাদ বলি শুন। বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর সমস্ত বাঙ্গালার স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ শিশুকন্যা শিশুপুত্র ধনী নির্ধন সকলেই আপন আপন অবস্থানুসারে আজিও নূতন বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে। আমরাও তখন পরিতাম। কিন্তু সে জন্য তখন আমার এত আহ্লাদ হইত কেন? সমস্ত বৎসর ধরিয়া সেই আনন্দোপভোগের প্রতীক্ষায় থাকিতাম কেন, খুলিয়া না বলিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে না। আমি এবং আমার দাদা দ্বারকানাথ আমাদের বাপের দুইটি মাত্র পুত্র ছিলাম। বাবা আমাদিগকে কখন ভাল কাপড় জুতা দিতেন না। আমরা সংবৎসর মোটা কাপড় পরিয়া, মোটা মার্কিণ থানের পিরাণ এবং মুড়ি শেলাই চাদর গায়ে দিয়া এবং নাগরা জুতা পায় দিয়া স্কুলে বল, নিমন্ত্রণে বল, সর্ব্বত্রই যাইতাম। কেবল পূজার সময় বাবা আমাদের দুই ভাইকে একখানি করিয়া ঢাকাই কাপড় ও চাদর, একটি করিয়া সাদা ফুলতোলা কাপড়ের জামা, একজোড়া করিয়া সাদা মোজা এবং এক জোড়া করিয়া জরির জুতা দিতেন। সেগুলি আমরা বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর পরিয়া যাত্রা করিয়া আসিয়া সদরবাটীতে শান্তিজল লইয়া সকলকে প্রণাম করিয়া বেড়াইতাম। সেই কাপড় জুতা পরিবার

আনন্দের প্রত্যাশায় সংবৎসর থাকিতাম। তাই আজ বিসর্জ্জন-জনিত অত বিষাদের মধ্যেও অত আনন্দ। চক্ষু বুজিয়া যখন বিজয়া দশমীর কথা ভাবি, তখন সেই অতুলনীয় বিষাদও যেমন, সেই অপরিমিত আনন্দও তেমনই শরীর লাভ করিয়া আবার আমার কাছে আসে, আর তখনকারই মতন আমাকে উৎফুল্ল করিয়া দেয়। সেটা কত প্রত্যক্ষবৎ বলি শুন। একদিন চক্ষু বুজিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। আমার স্ত্রী বলিলেন—শুধু শুধু অত হাসি কেন? আমি বলিলাম—শুধু শুধু নয়। ও আমার বাল্যকালের হাসি। স্ত্রী— সে আবার কি রকম? আমি—তবে বলি শুন। আমরা নয়ান চাঁদ দত্তের গলির একটা বাড়ীতে অনেক দিন ছিলাম। তখন ইস্কুলে পড়িতাম। কিন্তু বৃন্দাবন দাদার এমনই শাসন ছিল যে, ইস্কুলে যাইবার সময়ে ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে আমরা সদর দরজার চৌকাঠের বাহিরে পা দিতে পারিতাম না। একটা রবিবারে বেলা ৮টা কি ৯টার সময় চৌকাঠের উপর বসিয়া আছি, এমন সময় একটি লোক আসিল। কিছু দীর্ঘাকার, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ,তাহার চক্ষু দুটি এত বড় যে, ঘুমাইলেও বোধ হয় সমস্তটা বুজিত না। বোধ হয় নেশা করিবার দরুণ তাহার চক্ষু এরূপ হইয়াছিল। কোন্ নেশায় চোখ ওরূপ হয় বলিতে পারি

না। নেশাখোর ও ডাক্তারে বোধ হয় বলিতে পারেন। সে প্রতিদিন আমাদের বাড়ীতে তিলকুটো সন্দেশ দিয়া আসিত। সেদিন কিন্তু তাহার হাতে সন্দেশের হাঁড়ি ছিল না। আমি মনে করিলাম—বোধ হয় সন্দেশের দাম পাওনা আছে, তাহাই আদায় করিতে আসিয়াছে। এমন সময়ে আমার গিরিশভায়া আসিয়া তাঁহার সেই স্বাভাবিক উদ্ধত ভাবে বলিলেন—কে :হে তুমি, যাও, যাও, যাও। সে কিন্তু গম্ভীরভাবে তাহার সেই মোটা গলায় আধ বোজা চক্ষে উত্তর করিল—চিন্তে পারবে কেন? চিন্তে পারবে কেন? হাঁড়ি নাই যে। হাঁড়ি নাই যে। আমরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। এ সেই হাসি ; বুঝিলে ? আটচালা জুড়িয়া সপ পাতা হই-য়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে স্ত্রীলোকেরা বসিয়াছেন। ঘোষাল মহাশয় এবং আমাদের কুলপুরোহিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বালি-য়াল মহাশয় এবং আমাদের পাড়ার ৺কালাচাঁদ আচার্য্য মহাশয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের মস্তকে মায়ের অর্ঘ্য বুলাইয়া ছোঁয়া-ইয়া, মায়ের ফুল দিয়া আম্রশাখা দ্বারা সর্ব্বশরীরে শান্তি জল সেচন করিতেন। তাহার পর নূতন দেশী কাগজে নূতন লাল কালি দিয়া নূতন কলমে তিনবার করিয়া এই-রূপে দুর্গানাম লেখা হইত।

শ্রীশ্রীদুর্গা শ্রীশ্রীদুর্গা শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং শরণং শরণং

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্য্যন্ত পর পর দুর্গানাম লিখিত হইত। তাহার পর জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ অনুসারে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠদিগকে প্রণাম করিত, তাঁহাদের পায়ের ধূলা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া তাঁহাদের সহিত কোলাকুলি করিত। তাহার পর অন্দরে গিয়া স্ত্রীলোক দিগকে প্রণাম করিতাম, এবং তাঁহাদের পায়ের ধুলা লইতাম, তাঁহারাও আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন, এবং চিরকাল বেঁচে থাক, বিদ্যা হউক, ধন হউক, চির-কাল এমনি করিয়া মাকে আনিও, এই বলিয়া আমাদের দাড়িতে হাত দিয়া চুমো খাইতেন। আমরা আর এক যায়গায় যাইতাম, সেখানেও ঐরূপ হইত, এবং রসকরা বা খৈচুর একটু একটু খাইতাম। বাগ্দাপাড়ায়, মুসলমান-পাড়ায় এবং চাষাপাড়ায় গিয়াও এইরূপ প্রণাম করিতাম, পায়ের ধূলা লইতাম, হইল বা মিষ্টমুখ করিতাম, আর প্রাণ-ভরা আশীর্ব্বাদ লইয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ী ফিরিয়া আসি-তাম। তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। সে যে কি অপূর্ব্ব সুখ, এখানকার লোকে তাহা জানেন না, জানেন না বলিয়াই কাহারও সুখে সুখানুভব, কাহারও দুঃখে দুঃখা-নুভব করেন না। বঙ্গে বিজয়া দশমী আর হয় না।

বঙ্গে সুখে সুখী দুঃখে দুঃখীও আর নাই। বাঙ্গালীর উত্থান বড় কঠিন সমস্যা হইয়াছে। বাঙ্গালী বলিদানের প্রকৃত মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছে। প্রকৃত বলি দিতে হইলে কঠোর হইতে কঠোর হইতে হয়—কঠিন হইতেও কঠিন হইতে হয়। কারণ সে বলির সামগ্রী বাহিরে নাই—আমাদের নিজের নিজের অন্তরের মধ্যেই রহিয়াছে। সে বলি দিতে হইলে নিজের ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে উপড়াইয়া, নিজের নীচতা ক্ষুদ্রতাকে নির্ম্মূল করিয়া মায়ের পায়ে সমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ বলি দিতে যতদিন না শিখিব ততদিন আমরা সকলের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতে সমর্থ হইব না। এই জন্যই সন্ধি বলিদানের কথা বলিলাম। তান্ত্রিক বাঙ্গালার তান্ত্রিক প্রণালীতে মায়ের পূজা হউক, শক্তি সামর্থ্য সুখৈশ্বর্য্য আসিয়া পড়িবে।

আর একটা আনন্দের কথা বলি। বৈশাখ মাসে ইস্কুলে গ্রীষ্মের ছুটী হইলে বাড়ী যাইতাম। গিয়া দেখিতাম, কৌশিকী শুষ্কপ্রায়া। নদীতে মাছ ধরিবার সুবিধা। নদীর এ পার হইতে ও পার পর্য্যন্ত ৪'৫ হাত অন্তরে দুইটা মাটীর বাঁধ দেওয়া হইত। তাহাকে আমরা ডেঁ বলিতাম। আমি প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় হইলে নিশ্চয় বলিতাম, ইউরোপে হলাণ্ড দেশকে সমুদ্রের আক্র-

মণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে ডাইক (dyke) আছে, আমাদের এই ডেঁ শব্দ গ্রিম সাহেবের নিয়মানুসারে তাহারই অপভ্রংশ। দুই বাঁধেই একটা করিয়া ঘুনি বসান হইত। দুই দিক হইতে চুণা মাছ আসিয়া ঘুনিতে ঢুকিত—মধ্যে মধ্যে ঘুনি তুলিয়া তাহা ঝাড়িয়া লওয়া হইত। এইরূপ করিয়া প্রতিদিন ১/০ মণ ১।।০ মণ করিয়া চুণা মাছই ধরা হইত। আর বোয়াল প্রভৃতি বড় বড় মাছ দুই দিক হইতে জোরে আসিতে আসিতে বাঁধে বাধা পাইয়া বাঁধের মধ্যস্থিত খালে লাফাইয়া পড়িত। অমনই চাবিজালে* গ্রেপ্তার হইত। কাঁচা তেঁতুল দিয়া সেই বোয়াল মাছের অম্ল রান্না হইত—তাহা খাইতে অমৃততুল্য হইত—রাশি রাশি খাইতাম, কিছুমাত্র অসুখ হইত না। এখন ইস্কুল পাঠশালায় স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থে পড়িয়া আমরা শিখিতেছি যে এ মাছ সে মাছ খাইলে অসুখ হয়; তাই মাছ খাওয়ায় সেকালের সে বীরত্ব আর নাই। প্রকৃতার্থে স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থগুলিতে স্বাস্থ্যের বড় হানি করিতেছে; আর কিছুতে তত করিতেছে কি না সন্দেহ। ডেঁতে যখন আর বেশী মাছ পড়িত না, তখন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সমস্ত নদী গাবান হইত; অর্থাৎ

* চাবিজাল কাহাকে বলে, যিনি না জানেন, তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলি—আপনি এই পাড়াগেঁয়ে লোকের পাড়াগেঁয়ে কথা না পড়িলেই ভাল হয়।

নদীর জল এমনই আলোড়িত করা হইত যে, তলার পাঁক উপরে উঠিয়া পড়িত, সমস্ত জল ঘোলা হইত, আর সমস্ত মাছ তাড়া পাইয়া ভাসিয়া উঠিত। আমরা ছেলেরা নদী গাবাইতাম, আর সেই মাছ ধরিতাম। অধিকাংশই টেংরা মাছ। কিন্তু টেংরার কাঁটার ভয় করিতাম না। টপাটপ ধরিতাম, আর কোঁচড়ে ফেলিতাম। উপরে অসংখ্য চিল উড়িতেছে, জলে অসংখ্য মাছ ছুটিতেছে, আমরা অদম্য সাহসে এবং অসীম আনন্দে একবেলা ধরিয়া পাঁক ভাঙ্গিয়া মাছ ধরিতেছি, আর সেই ডুমুর গাছের তলায় মাকাল ঠাকুরের পূজা হইতেছে। সেওড়াপুলি হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত রেল বসিয়াছে। পোড়া রেল-রাস্তার জন্য আমাদের সেই ডুমুর গাছটি মারা গিয়াছে। পোড়া পথটা ঐখানে দু' হাত বাঁকাইয়া লইয়া গেলে আমাদের মনে এত ঘা লাগিত না। একটু বিবেচনা করিয়া লোকের প্রিয় বস্তুর প্রতি একটু একটু লক্ষ্য রাখিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ করিলে উহা এত অভিশাপগ্রস্ত হয় না; লোকের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কারণও হয় না। কি আনন্দের ব্যাপার, এই বৃদ্ধ বয়সে চক্ষু বুজিয়া তাহা আবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি—সেই অতুলনীয় নির্ম্মল আনন্দ শরীরী হইয়া আবার আমার কাছে আসিয়া আমাকে কোল দিয়াছে। বিধাতার কি করুণা, মানুষের

জন্য তিনি অসীম সুখের কি সহজ, সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন! তবু মানুষ বলে, জগতে সুখ নাই, কেবলই দুঃখ। মানুষ বড়ই নিমক্‌হারাম, ঈশ্বরে অনাস্থাবান্—নহিলে শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখের স্রোতে ভাসিত, আনন্দের ঢেউ সামলাইতে পারিত না। আর কবি—

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

এরূপ গান না গাহিয়া গাহিতেন,—

Our sweetest songs are those that tell of purest thought.

বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, যাহাকে Puberty বা যৌবনোদ্ভেদ বলে, তাহা ঘটিলে বুঝিতে পারা যায়, মন মলিন হইয়া পড়িয়াছে। শৈশবের সে রৌদ্রের সেই রং, উদ্ভিজ্জের সেই রং, বাতাসের সেই সুন্দব শান্তিময় নিশ্বাস আর নাই—অন্তর্জগৎ বহির্জগৎ সবই যেন মলিন বা আবিল হইয়া উঠিয়াছে। কিছুই যেন পূর্ব্বের ন্যায় নিখিরকিচ নাই, সকলেতেই যেন কি রকম একটা খিরকিচ আসিয়া ঢুকিয়াছে। তখন শৈশবের সেই আনন্দে আমার আর কুলাইল না। অন্য আনন্দের স্পৃহা হইল। বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইল। বিবাহ হইল। বিবাহ করিয়া

যত সুখ যত আনন্দ পাইব মনে করিয়াছিলাম—বিবাহ করিবার পর তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক সুখ ও আনন্দ পাইলাম। যাঁহার সহিত বিবাহ হইল, তিনি আমাতে এত মিশিলেন যে, তাঁহাকে একদিন না দেখিলে আমি অস্থির হইয়া পড়িতাম। এই যে ৪৫ বৎসর তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছি, ইহার মধ্যে ২৫ দিন মাত্র তাঁহার কাছ ছাড়া থাকিয়াছি। এই ২৫ দিনের মধ্যে ১৯ দিন তাঁহাকে দেওঘরে রাখিয়া কলিকাতায় আসিয়া ছুটী মঞ্জুর করাইতে লাগিয়াছিল। ২০ দিনের দিন দেওঘরে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে আর দেখি নাই, তাঁহার কেবল কঙ্কালখানা দেখিয়াছিলাম। তবুও ঐ ১৯ দিনে কলিকাতা হইতে তাঁহাকে ১৯ খানা পত্র লিখিয়াছিলাম। যখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ঢাকায় গিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না বলিয়া আমার ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়াছিলাম। যখন জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া যাই, তখনও ঠিক তাই করিয়াছিলাম। সে ঋণ আমার শোধ হইয়াছে। তাঁহাতে এত মিশিবার কারণ এই যে, তাঁহার গুণে তিনি আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সচরাচর যাহাকে রূপসী বা রূপবতী বলে তিনি তাহা নহেন, কিন্তু তাঁহার মতন মিষ্ট মুখশ্রী আর কোন স্ত্রীলোকের দেখি নাই। সে কেবল

তাঁহার গুণের বাহ্য অভিব্যক্তি বলিয়া। তাঁহার কোনও পার্থিব কামনাই দেখি নাই। কখনও আমার কাছে একখানি অলঙ্কার কি একখানি ভাল কাপড় কি নিজ প্রয়োজনে একটি টাকা চান নাই। তীর্থে যাইতে বলিলে, বলেন, তুমিই আমার তীর্থ, আমি তীর্থে যাইব না! তাই সম্প্রতি আমার মেজ মেয়ে, নান্নুমা, আমার বাড়ীতে আসিয়া গঙ্গাস্নানের কথায় বলিয়াছিল, মাকে একদিনও গঙ্গা নাইতে বা কালীঘাটে যাইতে দেখিলাম না। যখন জয়পুরে ছিলাম, তখন পুষ্কর তীর্থ আমাদের অতি নিকটে, কিন্তু আমার পত্নী সাবিত্রীর মাথায় সিঁদুর দিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন নাই। যখন জয়পুর হইতে ফিরিয়া আসি, তখন এলাহাবাদে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে ২ দিন ছিলাম। কিন্তু তখনও তিনি গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে ডুব দিতে চাহেন নাই। এইরূপ পত্নী পাইয়া আমি চিরজীবন সেই বাল্যকালের নির্ম্মল আনন্দের ন্যায় আনন্দে ভরপুর হইয়া আছি। আমার রোগ শোকের এত যে বাহুল্য, তাহাতে আমি সেই জন্য কাতর নহি। আমার পত্নীর সন্তান বলিয়া আমার হরনাথ, আমার প্রকাশনাথ, আমার নান্নু, আমার বুলা আমার এত প্রিয়। ইহাদের ভালবাসা ভক্তি আর সেবায় আমি চরিতার্থ। ইহাদিগকে সন্তান রূপে

পাইয়া আমার জন্ম ও জীবন সার্থক হইয়াছে। ভগবান ইহাঁদিগকে চিরকাল সুখে ও সাধুতায় রক্ষা করুন। ইহাঁদের সাধুতায় আমি সর্ব্বসুখে সুখী। বিধাতার পৃথিবী সুখে ভরা। আর প্রিয়তমা হইয়াছিল আমার সেই দুলুমা। সে আজ কয় মাস মাত্র স্বর্গে গিয়াছে। আমার মহালক্ষ্মীর চক্ষে জল পড়িতেছে। এমন পুণ্যবতীর এমন শোক কেন হয়? কেন হয়, বুঝিয়াছি। আমি মহাপাতকী—আমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার এমন শোক। আমার পত্নীর ন্যায় আমার মেয়েগুলিরও ভাল বস্ত্রালঙ্কারের কামনা নাই। ভগবানের অসীম কৃপায় আমার তিনটি পুত্রবধূও সর্ব্বপ্রকার স্পৃহাশূন্যা—ভাল জামা, ভাল অলঙ্কার কিছুই চান না, গরীবের পুত্রবধূর ন্যায় দিন রাত কেবল সংসারের কাজ করেন। বিধাতার কৃপায় আমার তিনটি জামাই এক একটি রত্ন। তিন জনেই অর্থাৎ শ্রীমান উমাপতি, শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রলাল, এবং শ্রীমান আশুতোষ, তিন জনেই সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র, তিনজনেই নিষ্কলঙ্ক। আমার এখন পাঁচটি পুত্র—উমাপতি, জ্ঞানেন্দ্রলাল, আশুতোষ, হরনাথ এবং প্রকাশনাথ। পাঁচটি পুত্রের চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও সর্ব্বপ্রকার সাধুতার জন্য আমি অসীম সুখের অধিকারী ইহাদের কাহারও ভোগবিলাসের স্পৃহা নাই। হরনাথ

কিছু সৌখীন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় পরোপকারপ্রিয় হৃদয়বান্ উদারচেতা সদালাপী সামাজিক মহামনা বালক আমি আর দেখি নাই। গৃহস্থালী কর্ম্মে প্রকাশনাথ অতুলনীয়। তাঁহাকে মুটেও বলিতে পার, মজুরও বলিতে পার। অল্প বয়সে আশুতোষের ঘাড়ে বৃহৎ সংসারের ভার পড়িয়াছে, কিন্তু তিনি অতি সাবধানে অতি সুবোধের ন্যায় সেই ভার বহন করিতেছেন। জ্ঞানেন্দ্রলাল স্বাধীনচেতা পিতার স্বাধীনচেতা পুত্র—তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যয়নপ্রিয়; উমাপতি অল্পবয়সে বড় ঘা পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মনের মাঝা শক্ত, তিনি অটল অবিচলিত থাকিবেন। ইঁহারা সকলেই দরিদ্রের মহামনা সন্তানের ন্যায় দরিদ্রতা শ্লাঘার বস্তু মনে করেন, এবং দরিদ্রের ন্যায় মোটা চাল চলনে জীবন যাপন করিতে ভালবাসেন। আমার এখন যে পাঁচটি কন্যা আছেন—অর্থাৎ তিন পুত্রবধূ ও দুই কন্যা—ইঁহারা এখনকার মেয়ের মতন নহেন; ভাল গহনা, ভাল কাপড়, ভাল জামা, গন্ধদ্রব্য, এই সকলের অভাবে ইঁহারা অসুখী বা অসন্তুষ্ট নহেন, এবং এ সকল থাকিলেও তাহাতে ইঁহাদের একরূপ অনাদর—এই সকল গুণের জন্য আমি ইঁহাদের পাইয়া অনন্ত সুখে সুখী। আমার সুখের কি পরিমাণ আছে? আমার দুইটি বড় নাতিনী—ইন্দুবালা এবং সরযূবালা বা চমু—

ইহারাও ইহাদের ঠাকুরমা, মা, খুড়ী জেঠাইয়ের মতন সর্ব্বরকমে নিঃস্পৃহ—সদাই গৃহকাজে ব্যাপৃত, এবং বুড়ো ঠাকুরদাদার সেবায় নিযুক্ত। আর আমার জামাইগুলির ন্যায় আমার নাতিনীজামাই, আমার ইন্দুরাণীর পতি, দাদা অমূল্যচন্দ্র মিত্রও নানাগুণের অধিকারী,—সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র, নিষ্কলঙ্ক, চরিত্রের বিশুদ্ধতায়, বৃথাভিমানশূন্যতায় এবং চালচলনের নম্রতায় আমার অমূল্যচন্দ্র যথার্থই অমূল্য। আমার নাতিনী সরযূবালা বা চমু রাণীর পতি পঙ্কজ ভায়া বিশুদ্ধ চরিত ও বিনয়ী এবং শ্রেষ্ঠে শ্রদ্ধাবান্। আমার পৌত্র শ্রীমান মহেন্দ্রনাথ অল্পবয়সে পিতৃহীন, কিন্তু প্রলোভনপূর্ণ কলিকাতা সহরে নিষ্কলঙ্ক আছেন। আমার সুখের সীমা নাই। আমি বড় ভাগ্যবান্। আমার উপর বিধাতার বড়ই কৃপা। আমার কর্ম্মফলে দুই চারিটা শোক পাইয়াছি বলিয়া বিধাতার নিন্দা করিলে বা তাঁহার উপর রাগ করিলে আমার নিমক-হারামীর সীমা থাকিবে না, পরকালে আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে। বিধাতা পরম সুখদাতা—পৃথিবী নানা সুখে পরিপূর্ণ। কে বলে জগতে সুখ নাই? যে বলে, সে সংসারের শত্রু, ভগবানের শত্রু।

চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ভরিয়া গেল, সেই

কালীপূজার আনন্দে। দুর্গাপূজা হইয়া গেল, স্কুলের ছুটী ফুরাইল, তবুও কিন্তু আমরা দেশেই রহিয়াছি। কালী-পূজা আসিল—কালীপূজার দিন আজো পাঁজো না করিয়া কলিকাতায় আসা হইতে পারে না। পাঁকাটীর আঁজো পাঁজো ত হইবেই। তাহার উপর একটা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড করিতে হইবে। আজ প্রায় এক মাস কাল ধরিয়া আমরা শুক্না তালপাতা কুড়াইয়াছি, এবং ১৫।২০ হাত লম্বা একটা বাঁশে সেই সকল তালপাতা বাঁধিয়াছি, এবং আমাদের বড় পুকুরের পশ্চিম পাড়ে সেই বাঁশটা পুঁতিয়াছি। আজ কালীপূজা; সন্ধ্যার পরই পাঁকাটির আটি জ্বালাইয়া আঁজো পাঁজো করিয়াছি—আঁজো পাঁজো করিতে করিতে সমস্বরে চীৎকার করিয়াছিঃ—

আঁজোরে পাঁজোরে বুড়ো বাপ্পারে।
ডাব নারিকেল চিনির পানা খাওরে।

পাঁকাটির আঁজো পাঁজো শেষ করিয়া নাচিতে নাচিতে বড় পুকুরের ধারে গিয়া সেই তালপাতায় আগুন দিয়াছি। শুক্নো তালপাতা জ্বলিয়া সমস্ত কৈকালার মাঠ আলো-কিত করিয়াছে—কি আহ্লাদ বল দেখি! শুনিতাম মাঠের অপর পারের দুল্লা প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা সেই ভীষণ আলোক দেখিয়া ভীত হইত। তাহাতেই আমাদের আরও মজা, আরও আহ্লাদ। সেই আহ্লাদ যেন জমাট

বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই জমাট বাঁধা এবং শরীরী আহ্লাদের সঙ্গে কোলাকুলি করিয়াছি। তেমনই আর একটা আহ্লাদের কথা বলি শুন। বৈশাখ মাস গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছি। কালবৈশাখী আরম্ভ হইল। তেমন কালবৈশাখী এখন আর হয় না। দিগন্তব্যাপী কাল মেঘ, তাহার পরেই ঝড়। অমনই মেয়ে পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলেরই আঁব-বাগানে যাওয়া। ঝড়ে আঁব পড়িতেছে—সেই আঁব কুড়ানো—যত আনন্দের কথা মনে ওঠে, এ আনন্দ সে সব আনন্দের চেয়ে বেশী। আঁধার আকাশের নীচে আঁধার পৃথিবীতে আঁব পড়িতেছে— দেখা যাইতেছে না। আঁব খুঁজিতেছি, আর চীৎকার করিতেছি,—

খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।

এমন করিয়া কত আঁব কুড়াইয়াছি, বলিতে পারি না। সেই মাছ ধরিবার আমোদ ও আঁব কুড়াইবার আমোদের ঝটকা এত বেশী ছিল যে, সহ্য করিয়া উঠা যাইত না। এই দুইটা আমোদ, আমোদের কালবৈশাখী ছিল। বড় প্রচণ্ড আমোদ। আর একদিন একটা পবিত্র ও প্রশান্ত আমোদের কথা মনে উঠিয়াছিল। সেই পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে মাঠে লক্ষীপূজার আমোদের কথা। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে গণ্ডা চারেক গুড়পিঠা বা নূতন

গুড়ের পরমান্ন দিয়া কুড়িখানাক সরুচাকলি বা সুরভি পয়রা গুড় দিয়া ১০।১২ খানা বাসি লুচি না খাইয়া বাড়ীর বাহির হইতাম না। সে দিন কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিলে মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া আমরা ৪।৫ জনে ধানের শীষের এক একটা মোটা আটি বা গোছা হাতে লইয়া মনসা-পোতায় যাইতাম। গিয়া দেখিতাম, রাইপিসী এবং কুড়ুনী দিদি আসন নৈবেদ্য ফুল তুলসী শাঁক ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি সব আনিয়াছেন। একটু বেলা হইলে ব্রাহ্মণ আসিয়া লক্ষ্মী পূজা করিতেন। আমরা আহ্লাদে এত জোরে কাঁসর বাজাইতাম যে, ২।১ দুই একবার কাঁসর ফাটিয়া গিয়াছিল। তাহার পর আমাদের খাওয়া আরম্ভ হইত। এক জন ময়রা একটা ধামায় করিয়া নূতন গুড়ের মুড়কী, মোয়া প্রভৃতি বেচিতে আসিত। ধানের শীষের গোছা বা আটি তাহাকে দিয়া আমরা খাবার কিনিয়া খাইতাম, এবং যে সব গরীব বাগ্দীর ছেলে মেয়ে পূজা দেখিতে আসিত, তাহাদিগকে খাওয়াইতাম। খানিক পরে কুড়ুনী দিদি আমাদিগকে চড়ুইভাতি রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। যে বালক চড়ুইভাতির আমোদ উপভোগ না করিয়াছে, তাহার জন্মই বৃথা হইয়াছে। সেই জন্যই ত নিম্ন-পাঠে চড়ুইভাতির কথা লিখিয়াছি। এক এক দিন সেইরূপ আর একটা আমোদে মন ভরিয়া উঠে।

শীতকালের প্রত্যূষে খেজুর রস খাইবার আমোদ। কালকেতুসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ যণ্ডা পরাণ মাল খেজুর গাছ চাঁচিয়া রস সংগ্রহ করিত। ভোরে কামারদের বাড়ীর সম্মুখের খোলা জায়গায় পরাণ সমস্ত রাত্রের রসে জ্বাল দিত। সেই মিহি, অনির্ব্বচনীয় সৌরভে দশখানা গ্রাম মাতিয়া উঠিত। আমাদেরও ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। আমরা মুড়ি এবং দুই একটা করিয়া ঘটি ও বাটি লইয়া সেইখানে গিয়া আগুন পোহাইতাম, এবং তাতরসিতে মুড়ি ভিজাইয়া মহা আনন্দে খাইতাম। গ্রামের বিস্তর লোককে সেখানে দেখিতাম। তাহারা তামাক খাইত, আর নানা কথা কহিত। এখন বোধ হয় যে, তাহারা সেইখানে আগুন পোহাইতে পোহাইতে মনের সুখে village polites অর্থাৎ দলাদলি প্রভৃতির আলোচনা করিত। পরাণ বড় ভাল লোক ছিল। আমাদিগকে বিস্তর রস দিত; আমরা ঘটি বাটি করিয়া তাহা বাড়ীতে আনিতাম। এই ব্যাপার মনে করিয়া আমার নিম্নপাঠে রামধনের খেজুর রস, এই নামের একটা পাঠ দিয়াছি। পরাণ মালের কথায় আর একটা আনন্দের কথা এক দিন মনে উঠিয়াছিল। আমি যখন শিশু, তখন কর্ত্তারা বাগবাজারের ৺রাজীবলোচন দত্তের বাড়ীতে থাকিতেন! কি সূত্রে থাকিতেন, জানি না; তাঁহা-দিগকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসা করা বাল-

কের বেয়াদবি মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই। দত্ত মহাশয়ের বাড়ার অতি নিকটে এক কলুর বাড়ী ছিল। সেখান হইতে আমি প্রতিদিন তেল নূন কিনিয়া আনিতাম। এই কারণে কলুর সহিত ভাব হইয়াছিল। কলু বেশ মানুষ; আমাকে তাহার ঘানি-গাছে বসিয়া ঘুরিতে দিত। সেটা ভারি একটা আমোদ ছিল। আমাদের কৈকালার পাশেই চোতাড়া গ্রাম। সেখানে আমাদের কটা কলুর ঘর ছিল। তখনকার খাঁটী সরিসার তেলের রং যেমন ছিল, কটা কলুর গায়ের রংও তেমনি ছিল। তাই তাহাকে কটা কলু বলা হইত। তেল আনিবার জন্য তাহার বাড়ীতে সর্ব্বদা যাইতাম। সেও আমাকে তাহার ঘানি-গাছে বসিয়া ঘুরিতে দিত। ভারি আনন্দ! এইরূপে অনেক নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়া ছিল। তাহাতে বড় সুখ; আমার মনে সেই সুখের স্মৃতি বড় প্রবল বলিয়া সিমলার বাজারে এখনও বাজার করিবার সময় চাষীদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া থাকি। দেখি, তাহারা সুন্দর লোক, আলাপ করিলে কত কথাই কয়, কত সদ্ব্যবহারই করে। তাহাদের জন কয়েকের নাম না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না,—যুধিষ্ঠির, গয়ারাম, ভুলু, অধর, অঘোর, নিবাস বক্সী, তিনকড়ি, ঈশান। গয়ারাম বড়ই ভাল মানুষ কিন্তু বুড়া হইয়া বাজারে আসিতে অসমর্থ

হইয়াছে। তাহার পুত্র নগেনটি বড় ভাল ছেলে—বাপের বেটা বটে, কিন্তু তাহাকেও ৫।৬ মাস বাজারে আসিতে না দেখিয়া বড় ভাবিত হইয়াছি। নিবাস গয়ারামেরই ন্যায় ভালমানুষ। ভুলু কখনও মন্দ জিনিস ভাল বলিয়া বেচে না। ভাল জিনিস না থাকিলে আমাকে স্পষ্টই বলে,—আপনাকে দিবার মতন জিনিস আজ নাই। তাহারা আমাকে নমস্কার করে। আমিও তাহাদিগকে নমস্কার করি। যুধিষ্ঠিরকে নমস্কার করিলে সে একদিন একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল—বলিয়াছিল সে কি? আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, নমস্কার করিতেছেন কেন? আমি বলিলাম,—দেখ যুধিষ্ঠির! সকলেরই ভিতর ভগবান আছেন। অতএব সকলেই সকলকে নমস্কার করিতে পারে। পাঁচ বছরের ছেলেকেও নমস্কার করিতে পারা যায়। বোধ হয়, যুধিষ্ঠির কথাটা বুঝিয়াছিল। সেই অবধি নমস্কার করিলে আর কিছু বলে না। হাসিতে হাসিতে আমাকেও নমস্কার করে। আর ভাল জিনিস যাহা থাকে, তাহা আমাকে দেখায়। এই সকল মূর্খ সাদা সরল লোকের সহিত সদালাপে বড়ই সুখ হয়।

আর পরীক্ষান্তের সেই আমোদ কি বিশুদ্ধ, কি মর্ম্মস্পর্শী! পরীক্ষার বহু পূর্ব্ব হইতে কেবলই পড়িতেছি, পড়িয়া পড়িয়া ক্লান্ত, তবু একটু বিশ্রাম নাই—কাহারও

সঙ্গে দুইটা কথা কহি ; অথবা দিবসে দুই পা বেড়াই, এমন অব সর নাই। না খাইলে নয়, তাই মৌনীর ন্যায় খাই ; না শুইলে নয় তাই শুই ; শুইয়াও কেবল সেই পড়ার কথা ভাবি। আমি প্রতিদিনই সমস্ত পঠিত বিষয়ের আদ্যোপান্ত পুনরালোচনা করিতাম। তাই ঘরে পড়ার সুব্যবস্থার জন্য আমার একখানি রুটিন থাকিত; যথা,—প্রাতে ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ইতিহাস। ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ভূগোল। ৮টা ইহতে ৯৷৷৹টা পর্য্যন্ত ইংরাজী-তাহার পর স্নানাহার ও কলেজ গমন। বৈকালেরও ঐরূপ নিয়ম ছিল। ইহার এক চুল এদিক্ ওদিক্ করি তাম না। সন্ধ্যার পর মহা ধুমাধুম করিয়া বাড়ীর সুমুখদিয়া একটা বর গেলেও, তাহা দেখিবারজন্য এক মিনিটের জন্যও বই ছাড়িতাম না। এই প্রণালীতে পড়িতাম এই জন্য যে, আমার একটা সঙ্কল্প ছিল যে,যখনই পরীক্ষা দিতে বলিবে, তখনই পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব, দু'ঘণ্টা পরে পরীক্ষা দিতে হইলেও পশ্চাৎপদ হইব না। প্রতি দিনই এইরূপে পড়িবার কয়েকটি সুবিধা দেখিতাম। আমাকে কখনও রাত্রি জাগিয়া বা midnight oil পোড়াইয়া পড়িতে হইত না। তখন সন্ধ্যার পর ৯টার সময় তোপ পড়িত। তোপ পড়িলেই আমি শুইতে পারিতাম। অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পাঠ করিলে পাঠে যে স্বল্পাধিকার

অবশ্যম্ভাবী, আমার বোধ হয়, তাহা ঘটিত না। পরীক্ষার্থ পাঠ্য নয় এমন অনেক পুস্তক পড়িবার সময়ও পাইতাম। আমার পাঠের প্রণালীর আর একটা লক্ষণ ছিল। আমি important unimportant দরকারী বেদরকারী প্রভেদ করিয়া পড়িতাম না, সমস্তই important দরকারী ভাবিয়া সমস্তই পড়িতাম। এই জন্য পরীক্ষা গৃহে কোন প্রশ্ন দেখিয়া হাঁ করিয়া ভাবিতে হইত না, এটা আবার কি! অত কম বয়সে ওরূপ প্রভেদ করাও নিরাপদ নয়। আর যে সে ওরূপ প্রভেদ করিয়া দিলেও তাহা মানিয়া লওয়া সমীচীন নয়। পরীক্ষার কয়দিন সন্ধ্যার পর ৮টার সময় শুইতে পারিতাম। আর সংবৎসর রাত্রি ৩টার সময় উঠিয়া ২ ক্রোশ ২॥ ক্রোশ বেড়াইয়া সূর্য্যোদয়ের সময় বাড়াতে ফিরিতাম। Leave not for tomorrow what can be done today—আজ যে কাজ করিতে পারা যায়, কাল করিব বলিয়া তাহা রাখিয়া দিও না—পঠদ্দশাতেও এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতাম, চাকরী করিবার সময়ও করিতাম। করিয়া দেখিয়াছি, কি পড়ায়, কি কর্ম্মকাজে কৃতকার্য্য হইবার এমন অব্যর্থ উপায় আর নাই। মাসের পর মাস এই ভাবে চলিতেছে, আর যেন পারা যায় না,—মনে হয়, আর না, পরীক্ষা দিব না,—এত কষ্ট আর সহ্য

হয় না, কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করে। পরীক্ষার কয় দিন কি কষ্টে, কি ভয়ে গেল, বলা যায় না। কিন্তু পরীক্ষা যে দিন শেষ হইল, আর বুঝা গেল, পরীক্ষা মন্দ দেওয়া হয় নাই, সেদিনের সেই আনন্দ কত গাঢ়, কত গভীর, কত নির্ম্মল, কত ব্যাপক,—তাহাতে আকাশ ও পৃথিবী যেন আমারই ন্যায় বন্ধনমুক্ত, আহার নিদ্রা যেন নূতন জিনিস, কত মিষ্ট, কেমন সেচ্ছাধীন! যে সে আনন্দ অনুভব করিয়াছে, কেবল সেই তাহার ধ্যান ধারণা করিতে পারে। ১৮৬৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের পুস্তকাগার যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে আমাদের এম্, এ, পরীক্ষা হয়। পরীক্ষক ছিলেন Lobb সাহেব, এবং McCrindle সাহেব। পরীক্ষার শেষ দিনে প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছিল। প্রবন্ধের বিষয় ছিল,—**On the causes of the comparative moderation with which the English Revolution of 1688 was on the whole effected.** বুঝিয়াছিলাম, প্রবন্ধ মন্দ লেখা হয় নাই। পূর্ব্বের কয় দিনের লেখাও মন্দ হয় নাই। তাই শেষ দিন কাগজ দিয়া চলিয়া আসিবার সময় ঘরের ভিতরেই চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম—"হরিবোল দাও।" কি আনন্দ বল দেখি! বুড়া বয়সে আবার ঠিক সেই যৌবনের আনন্দ! কম সৌভাগ্য কি! বিধাতার

কি কম কৃপা! আর একদিন চোখ্ বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে আর একটা সুন্দর কথা মনে উঠায় আপনাকে কৃতার্থ ভাবিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলাম। ইস্কুল কলেজের ছুটীতে যখন দেশে থাকিতাম, তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর খানিক ঘুমাইতাম। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিতাম, অনেকগুলি প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা আমার ঘরে বসিয়া আছেন। আমার কাছে কৃত্তিবাস কাশীদাস, কলঙ্ক ভঞ্জন প্রভৃতি শুনিবার জন্য তাঁহারা প্রতিদিন আসিতেন। আমাকে সুর করিয়া পড়িতে হইত। চোখে মুখে জল দিয়া কাঠাখানেক মুড়ি এবং একতাল মোহনভোগ খাইয়া আমি পড়িতে আরম্ভ করিতাম, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়িতাম। তাঁহারা আমার পড়ার খুব তারিপ করিতেন, তাহা শুনিয়া আমিও যে একটু ফুলিয়া উঠিতাম না, এমন নয়। জটিলা কুটিলার দর্পনাশের কথা শুনিয়া তাঁহাদের ভারি উল্লাস হইত। বলিতেন,—বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, সতীত্বের আবার নাড়া কি লা! জানিস না, মরবে মেয়ে, উড়বে ছাই, তবে মেয়ের কলঙ্ক নাই। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, আমাদের রোজ রোজ শুনাইও ত চাঁদ। আমিও রোজ রোজ শুনাইতাম। তাহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইত। চোখ বুজিয়া এখনও সেই আনন্দ ভোগ করিবার কোনও বাধাই

দেখি না। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ হয়, আমার জননীকে সকাল সন্ধ্যায় সেই সেকালের গঙ্গার বন্দনা সুর করিয়া পড়িয়া শুনাইবার কথা মনে করিয়া। ঐ বন্দনার ন্যায় সুন্দর জিনিস বাঙ্গালায় আর দেখি নাই। উহা যথার্থই বাঙ্গালীর লেখা বাঙ্গালা কবিতা। কোটী কোটী বাঙ্গালী নর নারীর চিরপোষিত আন্তরিক আশা আকাঙ্খা উহাতে অতি সহজ, অতি সাদা, অতি সরল, অলঙ্কার শূন্য, আস্ফালন বর্জ্জিত ঘরের ভাষায় ব্যক্ত। ঐরূপ কবিতাই বঙ্গের জাতীয় (National) বা স্বদেশী কবিতা। এখনকার রচনা হইলে উহা অসীম, অনন্ত, উত্তাল, অভ্রভেদী, কূলপ্লাবী, ঊর্ম্মি, হিমাচল প্রভৃতি লোকসাধারণের—বিশেষতঃ বঙ্গমহিলার অচেনা শব্দের দাপটে একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিস হইত। এইরূপ কবিতা পড়িতে পড়িতে—অর্থাৎ কৃত্তিবাস,কাশীদাস,গঙ্গার বন্দনা প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এ সকল আমাদের ঘরের কথা, ঘরের লোকের দ্বারা ঘরের ভাষায় লিখিত। মাইকেল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ,নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কবিতা, নানাগুণ সত্ত্বেও, যেন আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত ঘরের কথা নয়। সুতরাং মাইকেলের হেমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে বাঙ্গালী নর নারীর অন্তরের কথা নাই, যুগযুগান্তর হইতে সঞ্চিত

আশা আকাঙ্খা দেখি না। তাই বলি, তাঁহাদের কবিতা বাঙ্গালীর জাতীয় (National) কবিতাও নয়, স্বদেশী কবিতাও নয় ; সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কথা, বাঙ্গালী ভক্তের কবিতাও নয়। বঙ্গে এখন আর ভক্ত জন্মিতেছে না, রামপ্রসাদের পর ভক্ত হয় নাই বলিলেই হয়। একবার মাত্র দুই দিনের জন্য কেবল পরমহংস দেব দেখা দিয়াছিলেন। সুতরাং মর্ম্মস্পর্শী কবিতা বা গান আর রচিত হইতেছে না। একটা গল্প মনে পড়িল। বঙ্কিম দাদা হুগলীর ডিপুটী। যোড়াঘাটের উপর তাঁহার বৈঠকখানা। এক দিন সেইখানে বসিয়া বলিয়াছিলেন—মাইকেল পড়িলাম, ভাল লাগিল না। হেম পড়িলাম, ভাল লাগিল না। তখন শুনিলাম, এক ডিঙ্গীওয়ালা ডিঙ্গী বাহিয়া যাইতেছে, আর গাহিতেছে,—"সাধ আছে মা মনে, দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবীজীবনে।" গান বড় ভাল লাগিল। তাই বলিতেছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের সংস্কার সাধন করিতে হইলে, উহাতে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিতে হইলে, বাঙ্গালা গান বদলাইতে হইবে, নূতন করিয়া গান রচনা করিতে হইবে। নব্য বাঙ্গালায় এখনও জাতীয় এবং স্বদেশী কবিতা লিখিত হয় নাই। এখনও কেবল বিজাতীয় বিদেশী কাব্য ও কবিতা লিখিত হইতেছে। যখন দেখিব, বঙ্গের নূতন

কাব্য বা কবিতায় সুপরিচিত ঘরের কথা দেখিয়া দোকানী পশারী পর্য্যন্ত গাছতলায় বসিয়া কাশীদাস কৃত্তিবাস যেমন মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তেমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বুঝিব, বঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় ও স্বদেশী কাব্য বা কবিতা লিখিত হইতেছে। সাহিত্য যখন মূর্খের মন পর্য্যন্ত অধিকার করে, তখনই উহা শক্তিস্বরূপ হইয়া সমস্ত জাতির মনে শক্তি সঞ্চারিত করে, তাহার আগে করে না। আমাদের কাশীদাস ও কৃর্ত্তিবাস বহুকাল শক্তিরূপ ধারণ করিয়াছেন। পণ্ডিত মূর্খ, স্ত্রী পুরুষ, সকলকেই অধিকার করিয়াছেন। মেঘনাদবধ, বৃত্রসাহার এবং কুরুক্ষেত্র, এখনও শক্তি-শালী হয় নাই। কখনও হইবে কি না সন্দেহ। আর যাঁহারা "জানালার ধারে',, "কপাটের ফাঁকে", "পর্দ্দার আড়ালে", "আকাশ পানে", "আর বলিব না" প্রভৃতি উদ্ভুটে নাম দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লেখেন, তাঁহাদের কূল কিনারাই খুঁজিয়া পাই না। এইরূপ কবিতা, এমন কি, মাইকেল প্রভৃতি পর্য্যন্ত পড়িতে পড়িতে মনে হয়,--এ সব বাহিরের লোকের লিখিত বাহিরের কথা, কৃত্তিবাসাদির ন্যায় এবং সেই গঙ্গার বন্দনাদির ন্যায় ঘরের লোকের লিখিত ঘরের কথা নয়। বাহিরের কথা লিখিলে যে মহা পাতক হয়, তা নয়; কিন্তু বাহিরের

কথা ঘরের কথার মতন করিয়া না লিখিলে মহাপাতক হয় বৈ কি। বাঙ্গালা সাহিত্য যখন এখনও বৈদেশিকতায় পরিপূর্ণ, তখন কেমন করিয়া বলি যে, বাঙ্গালী স্বদেশভক্ত ও স্বদেশ-প্রিয় হইয়াছে? কাজেই বলিতে হয়, এই যে স্বদেশী সুর শুনা যাইতেছে, ইহা জোর করিয়া গাওয়া সুর। বাঙ্গালা সাহিত্যে এখনও বৈদেশিকতার বিরাট মূর্ত্তি দেখিতেছি। তাই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় বঙ্গে এখনও হয় নাই। বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। কাজেই যে সকল মহিলাকে কৃত্তিবাসাদি পড়িয়া শুনাইতাম, তাঁহাদের মধ্যে আমার সহধর্ম্মিণী থাকিতেন না। এখন তিনি নিজে একটু একটু পড়েন। রামায়ণ মহাভারতই বেশী পড়েন। বলেন রামায়ণ মহাভারত যতবারই পড়ি, ততবারই ভাল লাগে। অন্য বই একবার পড়িলে আর ভাল লাগে না। এই জন্য আমার অন্দরমহলে, অর্থাৎ যেখানে আমার পত্নীর প্রভুত্ব, সেখানে নবেলের বড় একটা দৌরাত্ম্য নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর তিনি কিছু বিরক্ত। বোধ হয় স্কুল কলেজে পড়া স্ত্রীলোক ছাড়া অপর সকল স্ত্রীলোকই কিছু বিরক্ত। আমারও উহা মিষ্ট লাগে না। আমার মনে হয়, ঐ ছন্দে কবিতা লিখিয়া মাইকেল একটা জঞ্জাল

ঘটাইয়া গিয়াছেন। সেই সেকালের পয়ার ও ত্রিপদী আমার বড়ই ভাল লাগে। কিন্তু এখন ঐ সকল সোজা সরল ছন্দ কিছু ঘৃণিত, মূর্খের ছন্দ বলিয়া উপেক্ষিত। হেমচন্দ্র মিষ্ট পয়ার লিখিতে পারিতেন। মাইকেলের হেঁপায় না পড়িলে বোধ হয় সমস্ত বৃত্রসংহার খানা পয়ারে লিখিয়া বঙ্গে যথার্থই বাঙ্গালীর প্রিয় বাঙ্গালা কাব্য একখানা রাখিয়া যাইতেন। আর সেই কাব্য-খানাকে বাঙ্গালী জাতীয় (National) এবং স্বদেশী কাব্য জ্ঞানে পুলকিত হইত। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান এবং দীনবন্ধুর সুরধুনী কাব্য পুরাতন ছন্দে লেখা। পড়িতে পড়িতে সকলেই আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত ঘরের কথা বলিয়া অনুভব করে। রঙ্গ-লালের কাব্যে হিন্দু রমণীর সতীত্বরক্ষার্থ আপন প্রাণ-বিসর্জ্জনের কথা আমাদের সেকালের ধরণে লিখিত হইয়াছে। আর সুরধুনী কাব্যের ত কথাই নাই। আমাদের গঙ্গামায়ের উৎপত্তিস্থান হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত মায়ের যে কূলে যত স্থানে আমাদের ধন ধান্য বিদ্যালয় অতিথিশালা পণ্ডিতসমাজ দেবালয় রাসমঞ্চ দোলমঞ্চ শিবমন্দির প্রভৃতি বিশাল হিন্দু সভ্যতার অগণ্য নিদর্শন আছে, আমাদের ঘরের কথায় তাহার অপূর্ব্ব বিবরণ দেখিতে পাই। যথা,—

(১)

কাটোয়া বিখ্যাত গঞ্জ, কত মহাজন,
সারি সারি ঘাটে তরী বাণিজ্যবাহন,
সরিষা, মসিনা, মুগ, কলাই মসুরি,
চাল, ছোলা বিরাজিত দেখি ভূরি ভূরি।

(২)

বাসুদেব সার্ব্বভৌম বিদ্যার ভাণ্ডার,
লোকাতীত মেধামতি অতি চমৎকার।

(৩)

অগ্রদ্বীপে উপনীত অর্ণবসুন্দরী,
বিরাজেন গোপীনাথ এই পুণ্যধামে,
সেবা হেতু জমীদারি লেখা তাঁর নামে,
সুগঠিত সুশোভিত মন্দির সুন্দর
অতিথির বাস জন্য বহুবিধ ঘর।"

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিদ্যালয়, অতিথিশালা, দেবালয়, দেবমন্দির প্রভৃতি আমাদের সভ্যতার সমস্ত ইতিহাস এই সুরধুনী কাব্যে দেখিয়া মোহিত ও উল্লাসিত হইতে হয়। একটা নদীর ধারে একটা বিরাট জাতির বিরাট ইতিহাস চিত্রিত—এ কি সামান্য জিনিস! মনে হয়, যেন আমাদের ঐশ্বর্য্যরূপিণী, ঐশ্বর্য্যশালিনী, ঐশ্বর্য্যদায়িনী মায়ের দুই কূল আমাদের বিপুল সভ্যতা দ্বারা বাঁধানো। আর মা আমাদের উচ্ছ্বসিতপ্রাণে যখন সেই বাঁধ

ছাপাইয়া যান, তখন মাঠকে মাঠ, গ্রামকে গ্রাম, জেলাকে জেলা মায়ের সোনার জলে ডুবিয়া যায়, আর যথাসময়ে সেই জল সুবর্ণবর্ণের শস্যরাশিতে পরিণত হয়। এমন মা কি আর কাহারও আছে! যেরূপ মায়ের দুইটি কূলমাত্র দেখিয়া সকলেই একটা বৃহৎ জাতির বৃহৎ সভ্যতার প্রকৃতি বুঝিতে পারে, সেরূপ মা কি আর কাহারও আছে! ঘরের কথায় পুণ্যতোয়া সুরধুনীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া দীনবন্ধু অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। ধিক্ আমাদের, আমরা তাঁহার নাটক লইয়া উন্মত্ত, কিন্তু সুরধুনী কাব্য পড়ি না। সুরধুনী কাব্য কেবল কাব্য নয়, ভারতবর্ষের অমন সজীব, সুন্দর সংক্ষিপ্ত পবিত্র ইতিহাস আমি ত আর দেখিতে পাই না।

সুরধুনী কাব্যের কথায় আমার স্বর্গীয়া মাতৃরূপিণী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কথা মনে হইল। তাঁহারও নাম ছিল সুরধুনী। মায়ের আদর, মায়ের স্নেহ, মায়ের যত্ন, মায়ের সোহাগ তাঁহার কাছে পাইতাম। মনে মনে এখনও পাই। আমার সৌভাগ্যবলে দিদি আমার শাঁখা সিঁদুর পরিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। আমার মেজ ভগ্নী মন্দাকিনীর অতি নিরীহ সরল প্রকৃতি ছিল, সাত কাহাকে বলে, তাহাও সে জানিত না, পাঁচ কাহাকে বলে, তাহাও জানিত না। আমার সৌভাগ্য-

ক্রমে সেও শাঁখা সিঁদুর পরিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিল। এখন কেবল আমার কোলের বোন বরদাসুন্দরী আছেন। তিনি কোন্নগর-নিবাসী ডাক্তার অমৃতলাল দেবের পত্নী। তিনি বড় বুদ্ধিমতী। আমার পূজ্যপাদ বন্ধু ডাক্তার প্রাণধন বসু তাঁহার বাড়ীতে চিকিৎসা করিয়া আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার ভগ্নীর মতন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক আমি দেখি নাই।" কিন্তু অমৃতভায়া বহুমূত্র রোগে আমারই ন্যায় জীর্ণ হইয়াছেন। কখন আছেন, কখন নাই, বলা যায় না। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমার বরদাসুন্দরীও যেন আমার অপর দুই ভগিনীর ন্যায় শাঁখা সিঁদুর পরিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

আমাদের শেষ পয়ার-প্রিয় ছিলেন অক্ষয় ভায়ার সর্ব্বজনসম্মানিত স্বর্গীয় পিতা রসসাগর গঙ্গাচরণ। তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত আমাদের ঘরের ও মরমের কথা পড়িতেছি। আর মনে করিলে সেই রকম কবিতা লিখিতে পারেন অক্ষয় ভায়া নিজে। বিশেষ, বঙ্গ ও বাঙ্গালী তিনি যেমন জানেন ও বোঝেন ও ভালবাসেন, তেমন আর কেহ নহে। সুতরাং মনে করিলে তিনি বঙ্গের কথা অতুলনীয় কবিতায় লিখিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তিনি মনে করিবেন বলিয়া আমার আশা নাই।

এ জন্মটা তিনি ঘটি ঘটি জল খাইয়া এবং লম্বা লম্বা ঢেঁকুর তুলিয়াই কাটাইয়া দিলেন। পদ্যে রবীন্দ্রনাথের অসাধ্য কিছুই নাই। কি জানি কেন, আমার এখনও কিন্তু মনে হয় যে, তিনি বাঙ্গালীর ঘরের কথা এবং মনের কথা ভক্তের ন্যায় ভালবাসেন না। তিনি বাঙ্গালা কবিতাকে জাতীয় ও স্বদেশী করিয়া তুলিবেন বলিয়া আশা হয় না। এক অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরের কথা ও মনের কথা ভক্তের ন্যায় ভালবাসেন, এবং পাঁতি পাঁতি করিয়া দেখেনও বটে। কিন্তু তাঁহার বিরাট আলস্যের কথা মনে হইলে তাঁহার কাছে যাইতে সাহস হয় না। তাঁহার বঙ্গপ্রিয়তার কথা একদিন কহিবার ইচ্ছা আছে। কহিতে পারিব কিনা, জানি না। অক্ষয়চন্দ্রের হৃদয় যে অতলস্পর্শ।

আমার বড়াই করিবার কথা একটা আছে। কথাটা সর্ব্বদাই মনে হয়, আর মনে হইলেই আনন্দ এবং একটু অহঙ্কারও হইয়া থাকে। আমার বয়স যখন ১২ কি ১৩ বৎসর, তখন আমাকে একবার কৈকালা হইতে একক কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাস, অল্প শীত পড়িয়াছে। প্রাতে বেলা ৯টার সময় ভাত খাইয়া রওয়ানা হইলাম। মাকে ছাড়িয়া আসিতেছি, এবং সঙ্গে কেহ নাই, নিতান্ত একলাটি আসিতেছি, এই জন্য মন

বড় বিষণ্ণ। কিন্তু ইস্কুলের ছুটী অনেক দিন ফুরাইয়াছে, বাবা বার বার কলিকাতায় আসিতে লিখিতেছেন, সুতরাং বুক বাঁধিয়া আসিতেছি। আসিব বৈদ্যবাটী ষ্টেশনে;—কৈকালা হইতে পাকা ৮ ক্রোশ। বেলা ২॥০ টার সময় বৈদ্যবাটী ষ্টেশনে গাড়ী আসিবে। তাহাতেই কলিকাতায় আসিব। বৈদ্যবাটীতে বেলা ১টার পরেই আসিলাম। দোকানে বসিয়া রহিলাম এক ঘণ্টার কম নয়। তাহার পর গাড়ী আসিলে কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। চারি ঘণ্টায় পাকা ৮ ক্রোশ পথ হাঁটিয়াছিলাম। ১২ বছরের বালকের পক্ষে এটা একটা বিক্রম বলিয়া মনে করিয়া একটু অহঙ্কার অনুভব করি। অন্যায় করি কি? এখনকার বয়স্কেরা চারি ঘণ্টায় ৮ ক্রোশ হাঁটিতে পারেন কি?

আর একটি কথা মনে হইলে বড়ই বিমল আনন্দ অনুভব করি। Branch Oriental Seminary-তে পড়ি। বয়স ১৪ বৎসর। আমাদের শ্রেণীতে একটি নূতন মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। Main ইস্কুলের হেডমাষ্টার স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় অর্থাৎ Star থিয়েটরের অমৃতলালের পিতা শিক্ষকটিকে আনিয়াছিলেন। তাঁহার সব ভাল, কিন্তু বয়স বড় কম। তাঁহার অপেক্ষা বয়সে বড় এমন অনেক দুর্দ্দান্ত ছেলে

আমাদের শ্রেণীতে পড়িত। তাহারা নূতন শিক্ষকের শত্রুতা করিতে লাগিল। ইচ্ছা নয় যে, তাহাদের অপেক্ষা কম বয়সের লোক তাহাদের শিক্ষকতা করে। তাহাতে তাহাদের লজ্জাবোধ হয়। সেইজন্য তাহারা তাঁহাকে নানারূপে জ্বালাতন করিতে লাগিল। আহিরীটোলার ছেলেদের দুষ্ট বলিয়া অখ্যাতি ছিল। শিক্ষকটির নাম মনে নাই—বোধ হয়, সারদা। তিনি পড়াইতে আসিলেই বিদ্রোহী বালকগুলি গোল করিয়া তাঁহাকে পড়াইতে দিত না। তিনি এণ্ট্রান্স পাস করিয়াছিলেন। আহা, বেচারা একদিন এণ্ট্রান্সের সার্টিফিকেটখানি আনিয়া সকলকে দেখাইয়াছিলেন,এণ্ট্রান্সের সার্টিফিকেটে তত লেখা এখন থাকে না ; তখনকার সার্টিফিকেট foolscap কাগজের আধখানা ছিল, খরচ কমাইবার জন্য এখনকার সার্টিফিকেট এক চিল্‌তে কাগজ—দেখিলে অশ্রদ্ধা হয়। বোধ হয়, আশা করিয়াছিলেন যে, উহা দেখিলে সকল ছেলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাহা হইল না। বিদ্রোহীরা তেমনই বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিল। তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিতাম। তাঁহার জন্য আমার বড় দুঃখ হইল। আমি অনেককে বুঝাইলাম। কিন্তু কিছুই হইল না।

তিনি কৈলাস বাবুকে জানাইলেন। কৈলাস বাবু আমাদের ক্লাসে আসিলেন। কে বিরুদ্ধাচরণ করে, আমাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখিলাম, আমার উপর বড় বড় কটাক্ষ পড়িতে লাগিল। আমি কিন্তু নির্ভয়ে তাহাদের নাম বলিয়া দিলাম। কৈলাস বাবু গোঁপের বাম প্রান্ত কামড়াইতে কামড়াইতে চলিয়া গেলেন। এক মনে চিন্তা করিবার সময় ঐরূপ করা তাঁহার রীতি ছিল। দণ্ডের কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে গরাব শিক্ষকটিকে আর কেহ বিরক্ত করিল না। বুঝিলাম, একটি অতি সুশিক্ষিত কর্ত্তব্যপরায়ণ অন্নহীনের অন্ন বজায় রহিল। এরূপ না হইলে তাঁহাকে ছেলেগুলার জ্বালায় চাকরী ছাড়িয়া পলাইতে হইত। আহা তাঁহাকে সেই বিপদে রক্ষা করিবার জন্য কিঞ্চিৎ করিতে পারিয়াছিলাম মনে হইলে এখনও কি একটা আনন্দ জন্মে, তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। আমার মনই জানে, সে কি আনন্দ! আর জানেন সর্ব্বসুখদাতা বিধাতা। তাই মনে হয় যে, ইহলোক হইতে প্রস্থানকরিয়া যখন পরলোকের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইব, তখন বোধ হয় সেখান হইতে আমাকে বিতাড়িত হইতে হইবে না। হইলেই বা কি করিতে পারিব? যাহা ঘটিবে, তাহাই কর্ম্মফল বলিয়া হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু

এই যে আত্মপ্রসাদটুকু, এটুকু বোধ হয় মারা যাইবে না। না গেলেই আমার যথেষ্ট হইবে। তাহার বেশী পাইবার অধিকার বা প্রয়োজন আমার আছে, এরূপ বিশ্বাস বা ধারণা আমার এ পর্য্যন্ত নাই।

আর একদিন চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে মাধব কাকার সেই খাওয়ার কথা মনে হইল। আমাদের পাড়ায় মাধবচন্দ্র বসু এবং ঈশানচন্দ্র বসু নামে আমার দুই কাকা ছিলেন। কাকারা এবং কাকীরা আমাদিগকে বড়ই ভালবাসিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমরা তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতাম, গল্প করিতাম, মুড়ি চা'ল-ভাজা খাইতাম, ইত্যাদি। একদিন সন্ধ্যার সময় গিয়া শুনিলাম যে, আজ মাধব কাকা দিগম্বর দাদার সঙ্গে বাজি রাখিয়া নাকি ১ সের ময়দার রুটী খাইবেন। পাকি ২ সের ময়দার রুটী হইল। প্রতি সেরে ৪১॥ খানা করিয়া মাঝারি রুটী হইল। মাধব কাকা /১ সের ময়দার রুটী খাইতে বসিলেন। বাকী /১ সের ময়দার রুটীতে আমাদের ৫।৭ জনের জলযোগ হইল। রুটীর সঙ্গে মাধব কাকা পোয়া তিনেক দুধ, খানিকটা গুড়, আর আধ সের আড়াই পোয়া তরকারি লইলেন। দুধে খান আষ্টেক রুটী ফেলিলেন। তার পর খাইতে আরম্ভ করিলেন। যখন অর্দ্ধেকেরও বেশী খাওয়া হইল, তখন

বোধ হইল যেন মাধব কাকার কিছু কষ্ট হইতেছে। তাঁহার বড় মেয়ে প্রসন্নময়ী তাই দেখিয়া আমাদিগকে বলিলেন,বাবাকে ভোরে ভাত খাইয়া কলিকাতায় যাইতে হইবে, উহাঁকে আর খাইতে বারণ কর, আমি পাঁচ টাকা দিব। মাধব কাকা শুনিয়া বলিলেন—তোদের ভাবিতে হইবে না, তোরা ভোরে আমার জন্য ভাত রাঁধিস, আমি খাইয়া কলিকাতায় যাইব। খানিক পরে মাধব কাকা সেই রুটীর কাঁড়ি, দুধ, গুড় ও তরকারি শেষ করিলেন। আমরা মহোল্লাসে শাঁক ঘণ্টা কাঁসর বাজাইলাম। খুব প্রত্যূষে উঠিয়া মাধব কাকার বাড়ীতে ছুটিয়া গেলাম। গিয়া শুনিলাম, তিনি অনেক আগে যেমন ভাত খাইয়া থাকেন, তেমনি ভাত খাইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। কিন্তু সেই কথা মনে হইলে এখন কেবল ভয় ভাবনা হয়। আমাদের সে খাওয়া কোথায় গেল, ভাবিয়া বিষাদে মগ্ন হই। আমদের ভোজনশক্তি যে কমিয়াছে, হীরেন্দ্রনাথ নাকি তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহাকে জানাইবার জন্য মাধব কাকার খাওয়ার কথা লিখিলাম।

চক্ষু বুজিয়া ইহার অপেক্ষা উচ্চতর গাঢ়তর আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি। উহা মানুষের পরার্থপরতা, পরোপকারপ্রিয়তা এবং মহত্ত্ব দেখিবার আনন্দ। যাঁহারা

আমাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য, এবং যাঁহাদের প্রাণ লইয়া আমার প্রাণ, তাঁহাদের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য আপন আপন স্বার্থ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান, এ জন্মে তাঁহাদিগকে ভুলিতে ত পারিবই না, অধিকন্তু তাঁহাদের মহত্ত্ব ভাবিয়া অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করিব, এবং কেমন করিয়া মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হয়, তাহাও শিখিব। তাঁহাদের কয়েক জনের নাম না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না ঃ—

(১) স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার।

(২) স্বর্গীয় ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু।

(৩) ভারতের প্রথম শ্রেণীর অস্ত্রচিকিৎসক শ্রীসুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

(৪) পূজ্যপাদ ডাক্তার প্রাণধন বসু।

(৫) আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ সেন।

(৬) আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন।

(৭) কবিরাজ ও ডাক্তার সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী।

(৮) কবিরাজ গোপালচন্দ্র রায়।

(৯) কবিরাজ প্রকৃতিপ্রসন্ন সেন।

(১০) ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন।

(১১) হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

(১২) পরম স্নেহাস্পদ ডাক্তার শ্রীসত্যশরণ চক্রবর্ত্তী।

আর যাঁহারা আমার ভাবনায় ভাবিত হন, আমার কঠিন পীড়া হইলে আকুল হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সংখ্যা করিতে পারি না। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন তাঁহারা আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তাঁহাদেরও নাম করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাঁহাদের নামের তালিকা পাঠকের বিরক্তিকর হইবার সম্ভাবনা। তাঁহারা আমার আত্মীয় নহেন, কিন্তু আত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয়; আমি তাঁহাদের কাহারও কোনও উপকার করি নাই, তথাপি আমার প্রতি তাঁহাদের অসীম স্নেহ। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, মানব-প্রকৃতিতে এখনও মহত্ত্ব পরার্থপরতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণ সকল বিদ্যমান আছে; মানুষ এখনও নীচ হয় নাই; মনুষ্যকুলে এখনও বহু ব্রাহ্মণ জন্মিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বড় আনন্দিত, বড় উৎসাহিত হইতে হয়। বিধাতার সৃষ্টিকৌশল এতই সুন্দর যে, উচ্চ নীচ মধ্যবিত্ত সকলেরই ভাগ্যে শ্রেষ্ঠ-প্রকৃতির মানবের সংসর্গ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ সুখ ও আনন্দ কাহারো দুষ্প্রাপ্য নয়। শুনিয়াছি, বিদ্যা-সাগর মহাশয় শেষ দশায় মানুষের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে Misanthropic হইয়া পড়িয়াছিলেন, কেন হইয়া-

ছিলেন, তাঁহার জীবনচরিতে লেখে না। তাঁহার একখানা জীবন চরিত আগাগোড়া পড়িয়াছি। তাহাতে ও কথা দেখি নাই। উহা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত জীবন চরিত। জীবনচরিতে ঐরূপ কথাই থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের দুরদৃষ্টক্রমে উহা প্রায়ই বাজে কথায় পরিপূর্ণ থাকে। আমি যাঁহাদের কাছে চির-ঋণী, তাঁহাদের ২।৪ জনের কথা আমাকে বলিতেই হইবে। যাঁহাদের কথা বলিলাম না, তাঁহারা সকলেই কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমাকে জগতের আনন্দময় কোষে রাখিয়া দিলেন।

আমার আর্থিক অবস্থা যখন বড়ই শোচনীয়, এবং আমার ঋণের পরিমাণ চারি পাঁচ হাজার টাকা, তখন আমি হাইকোর্টে যাই। কিন্তু হাইকোর্ট আমার ভাল লাগিল না। সেখানকার হাওয়া প্রীতিকর নয়। উকিলেরা শিক্ষিত, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব অপেক্ষা অসদ্ভাবই বেশী। তাঁহারা পরস্পরের কুৎসা করেন, এবং অনিষ্টের চেষ্টা করেন। বড় ঈর্ষাপরায়ণ। সেখানে যত টাকা আপীল করিবার পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, মোক্তার মহাশয়কে তাহার অনেক অধিক টাকার রসীদ লিখিয়া দিতে হয়। এক দিন আমার কাছে আমার মুহুরী একটা খাস আপীলের কাগজপত্র আনিয়াছিল।

কিরূপ অপদার্থ অজুহাতে খাস আপীল দাখিল করা হয়, আমি জানিতাম। আমি দেখিতাম উকীল মহাশয়রা নিম্ন আদালতের বিচারে দোষ ক্রুটী হইয়া থাকিলে তাহার প্রতিকার করাইবার জন্য যত না হউক, আদালত দ্বারা তিরস্কৃত হইতে না হয় এমনি কৌশল করিয়া আপীলের দরখাস্ত রচনা করিয়া গোটাকতক টাকা হাতাইবার জন্য বেশীর ভাগ আপীলের দরখাস্ত দাখিল করেন। আমার টাকার বড় দরকার স্থতরাং কাগজপত্র দেখিয়া বলিলাম, আপীল দাখিল করিব, কিন্তু ২৫৲ টাকা পারিশ্রমিক লইব। মওয়াক্কেল সম্মত হইয়া ষ্টাম্প কিনিতে গেল; কিন্তু আজও গেল, কালও গেল। আমার মুহুরীকে অনুসন্ধান করিতে বলিলাম। মুহুরী আসিয়া বলিল, অমুক উকীল ২০৲ টাকায় করিয়া দিব বলিয়া তাহাকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে। শুনিয়া আমার বিজাতীয় ঘৃণা হইল। একব্যক্তি নিজের মোকদ্দমা নিজে আমার কাছে আনিয়াছিল অর্থাৎ তাহার সঙ্গে মোক্তার ছিল না। মোক্তার থাকিলে আমি ২০৲ কি ২৫৲ টাকার বেশী পাইতাম না। কিন্তু মোক্তার নাই দেখিয়া স্থবিধা বুঝিয়া কোপ করিয়াছিলাম, ২৫৲ টাকার স্থলে ১২৫৲ টাকা লইয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম এ ব্যবসায়ের প্রলোভন বড়। এ ব্যবসায় দরিদ্রের পক্ষে মারাত্মক।

আমি দরিদ্র। এ ব্যবসায় ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। এ সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের কথা মনে হইল। তাঁহার একখানি চিঠির জোরে আমি ডিপুটী মেজেস্টরী পাইলাম। পাইয়া ঢাকায় গেলাম। যখন যাই, বঙ্কিম দাদা আমাকে বলিলেন,—যাইতেছে যাও, কিন্তু টিকিতে পারিবে না। টিকিতে পারিও নাই। দেখিয়াছিলাম, হাকিম পুলিসের আজ্ঞাবহ ভৃত্যস্বরূপ। পুলিসের মনোমত জেল জরিমানা না করিলে, কর্ত্তৃপক্ষের অসন্তোষভাজন হইবার সম্ভাবনা। একটা মোকদ্দমায় পুলিস আমাকে শাসাইয়া এক ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা অন্যায় না হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু পুলিসের আচরণ যে নিতান্ত অসভ্য, অসম্মানজনক ও উদ্ধত হইয়াছিল, তাহাতে আমার সন্দেহ ছিল না। আমি মেজেস্টর সাহেবের কাছে পত্র লিখিয়া নালিশ করিয়াছিলাম। তিনি লিখিলেন,—I see no reason to interfere। আমি বুঝিলাম,—পুলিসের মন যোগাইয়া চলিতে না পারিলে ডিপুটীগিরি করিতে পারা কঠিন। ডিপুটীগিরি ছাড়িয়া দিলাম। এইবারে স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কথা আমার মনে উঠিল। ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে জয়পুর

কালেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া জয়পুরে গেলাম। পথখরচের জন্য জয়পুর হইতে এক শত টাকা আসিল। কিন্তু তাহাতে সপরিবারে অত দূর যাওয়া হয় না। পত্নীকে কলিকাতায় রাখিয়া যাইতেও পারিব না। আবার দেনা করিয়া সপরিবারে জয়পুরে গেলাম। সেখানে কান্তি বাবু আমার বড়ই আদর যত্ন করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন আমাকে খুব বড় করিবেন। তা তিনি করিতে পারিতেন। তিনি তখন জয়পুরের রাজা বলিলেই হয়। Conscience টাকে একটু মুচড়াইয়া ৫।৭ বৎসর থাকিলে আমি মস্ত ধনী হইয়া যাইতাম। কিন্তু জয়পুরের তাত আমার সহ্য হইল না, এবং রাজসভার হাওয়াও ভাল লাগিল না। সেখানে সাহেব ও ভক্তিন নামে অভিহিত চরিত্র হীনাদের প্রতিপত্তি কিছু বেশী। একটী ঘটনায় ইহাও বুঝিলাম যে, স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আমার জয়পুরে থাকা সম্ভব হইবে না। আমি দু' মাসের ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলাম। তখনকার মহারাজ রাম সিংহকে বড় বিনয়ী ও অমায়িক দেখিয়াছিলাম, এবং উৎকোচাদি লয়েন না বলিয়া অনেকের মুখে কান্তিবাবুর সুখ্যাতিও শুনিয়া আসিয়াছিলাম। জয়

পুরে কেবল পাহাড় ও বালি—আমি ভারতের উদ্যানসদৃশ বঙ্গের মানুষ, সে কঠোর দৃশ্য আমার ভাল লাগিল না। সহর দেখিতে বড় সুন্দর, কিন্তু তাহাতে একটি তৃণ বা এক ফোঁটা জল দেখিতে পাইবার যো নাই। আমি দু' মাসের ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প জয়পুরে আর যাইব না। না খাইয়া মরি, সেও ভাল, তবু যাইব না। বিধাতার কৃপায় না খাইয়া মরিতে হইল না। সেই সময়ে বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ Lawler সাহেবের মৃত্যু ঘটিল। আমি তাহা জানিতে পারি নাই। আমার পরম হিতৈষী—কৃষ্ণদাস পাল আমাকে সে কথা জানাইলেন। আমি সেই কর্ম্মের জন্য শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ Croft সাহেবের কাছে দরখাস্ত করিলাম। দরখাস্ত লিখিয়া নিজেই লইয়া গেলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন,—Shall I guess why you have come? আমি বলিলাম,—আপনি ঠিক বুঝিয়াছেন। বুঝিলাম,—কর্ম্মটি তিনি আমাকে দিবেন। আমি বলিতে বলি নাই, তথাপি স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস ঐ কর্ম্মটি আমাকে দিবার জন্য Croft সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। Croft সাহেব জানিতেন, আমি ডিপুটিগিরি ছাড়িয়াছিলাম, এবং জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষগিরিও ছাড়িয়াছিলাম। তিনি

আমার হিতৈষীকে বলিলেন,—"If he again proves a rascal, the responsibility will be both yours and mine." আমার হিতৈষী উত্তর করিয়াছিলেন,—"He is not to blame. He can not settle down to what he does not fully like." Croft সাহেব ছুটী লইয়া বিলাতে গেলেন। আমার শিক্ষাগুরু তাঁহার কাজে বসিলেন। লাইব্রেরীর জন্য লোকনির্ব্বাচনের ভার এখন তাঁহার হাতে। তিনি আমাকে ঐ কর্ম্ম দিলেন। বেতন ২০০৲ হইতে ২৫০৲। আমি কিন্তু চিরকালের জন্য বাঁচিয়া গেলাম। এবং বিধাতার কাছে এখনও Croft ও Tawney সাহেবের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

আমার চাকরী হইলেই আমার পাওনাদারেরা টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদিগকে টাকা দিই কেমন করিয়া? মাসে দুই শত করিয়া টাকা ঘরে আনিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু আমার খরচের অবধি ছিল না। তখন তিনটি পরিবারের উদরান্নের ভার আমার উপর। তাহাদিগকে অনাহারে রাখিয়া আহার করিতে হইলে আমার শূকরের বিষ্ঠা ভোজন করা হইত, এবং হৃদয়ের যন্ত্রণায় আমাকে ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতে হইত। ঐ কয়টি পরিবারকে মাসে

মাসে কিছু কিছু টাকা দিতাম। অনেক স্ত্রীলোকের বিশ্বাস যে স্বামার উপার্জ্জিত অর্থে স্ত্রী ভিন্ন আর কাহারো অধিকার নাই, এবং অপরকে স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থের ভাগ পাইতে দেখিলে তাঁহারা মহা গণ্ডগোল বাধাইয়া থাকেন। স্বামীকে তাঁহাদের অর্থসাহায্য করিতে না দিয়া তাঁহাদিগকে বিষম অনশন কষ্টে ফেলিয়া দেন, এবং স্বামীর যন্ত্রণার একশেষ করিয়া থাকেন। ভগবানের অসীম কৃপায় এবং আপন স্বভাবের গুণে আমার পত্নী আমাকে কখনও ঐ সকল অনশনক্লিষ্ট পরিবারের অর্থসাহায্য করিতে নিষেধ করেন নাই। নিষেধ করা দূরে থাকুক, কোন্ পরিবারের জন্য কত টাকা দিতাম, তাহা আমাকে কখনও জিজ্ঞাসাও করেন নাই। এবং এখনও জানেন না। যাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতাম, তাহাদের কাহারো কাহারো সহিত তাঁহার একটু দাদেয়িজার ভাব ছিল। তিনি যদি আমাকে ধরিয়া বসিতেন, উহাদিগকে তুমি কিছুতেই টাকা দিতে পারিবে না, তাহা হইলে নিরুপায় হইয়া আমাকে অনেকের অনশন কষ্ট দেখিয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু আমার পত্নীর জন্য তাহা ভোগ করিতে হয় নাই। ইহা কি সাধারণ সুখ? এ সুখের পরিমাণও হয় না, কল্পনাও হয় না। বিধাতার কৃপায় আমার পত্নিভাগ্য

অতুলনীয়। তাঁহার এইরূপ মহত্ত্ব না থাকিলে এ জন্মটা আমাকে মনুষ্যমধ্যে চণ্ডাল হইয়া এবং চক্ষের জলে ডুবিয়া থাকিতে হইত। আশীর্ব্বাদ করি, এবার জন্মগ্রহণ করিয়া আমার মহালক্ষ্মীকে যেন আমার মত মহাপাতকীর সহধর্ম্মিণী হইবার ফলে চোখের জল ফেলিতে না হয়। অথবা আমি কি এমন মানুষ যে, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব? তিনিই আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন জন্ম জন্ম তাহাকে পাইবার আশা আকাঙ্ক্ষা রাখিতে পারি। যে কয়টি পরিবারকে ভাত দিতে হইত, আমার পত্নীর পুণ্যবলে তাহাদিগকে আমার আর অর্থসাহায্য করিতে হয় না, তাহারা আপনাদের অন্ন আপনারা বিধাতার কাছে পাইতেছে; প্রার্থনা করি, চিরকাল পাউক। কিন্তু তাহাদের কাহাকে কত টাকা দিতাম, আমার পত্নী তাহা এখনও জানেন না, আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন না, আমিও বলি নাই, বলিবও না। তাঁহাকে কেহ (অবশ্য একটু কুমতলবে) জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়া থাকেন,—"ও সব টাকা কড়ির কথা, আমি কি জানি বোন? ও সব পুরুষেরা জানেন। জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করিও" বড় ভাগ্যবান্ না হইলে, এমন সহধর্ম্মিণী পাওয়া যায় না। আরো একটু বলি :—

'দেনা শোধ হয় কেমন করিয়া, ভাবিতে লাগিলাম।

দেনা ৪।৫ হাজারের কম নয়, এবং প্রতিদিন সুদ বাড়িতেছে। পত্নী বলিলেন,—আমার গহনা বন্ধক দিয়া যে ঋণ করা হইয়াছে, আগে সেই গহনা বিক্রয় করিয়া তাহা শোধ করা হউক। আমি বলিলাম, তা আমি পারিব না, একে তোমার গহনা অতি অল্প, তাও বেচিয়া ফেলিব? আমা দ্বারা তাহা হইবে না। তিনি বলিলেন, স্ত্রীলোকের স্বামীর চেয়ে গহনা আর নাই। তুমি বিক্রয় কর। তাহা হইলে তোমার দেনা আর বড় বেশী থাকিবে না, অল্প টাকা কর্জ্জ করিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল। আমি আর অমত করিতে পারিলাম না। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই কার্য্য হইল। হইয়াও কিন্তু এত দেনা রহিল যে, টাকা কর্জ্জ না করিলে তাহার পরিশোধ হয় না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ইষ্টেটের ম্যানেজার এবং গৌরমোহন আঢ্যের ইস্কুলের সেক্রেটরী আমার চিরসুহৃৎ এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর তুল্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ধরিলাম। তিনি অল্প সুদে অর্থাৎ শতকরা ৬৲ টাকা সুদে আমাকে হাজার টাকা কর্জ্জ দেওয়াইলেন। কর্জ্জ দিলেন ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র সাধু সুপণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ৺ অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র আমার চিরকৃতজ্ঞতাভাজন শ্রীরূপলাল মিত্র

মহাশয়। প্রতি মাসে সুদ সহ পঞ্চাশ টাকা করিয়া পরিশোধ করিতাম। আমার বৃহৎ সংসার পালনের জন্য দেড় শতেরও কম টাকা থাকিত। আমার পত্নী তাহাতেই সংসার চালাইয়া প্রতি মাসে আমার হাতে কিছু কিছু দিতেন। সংসারে কাহারো কষ্ট বা অসন্তোষ ছিল না। এইরূপে চারি পাঁচ হাজার টাকার ঋণ পরিশোধ করিয়াও যে ভাবে ছিলাম, তাহাতে লোকে মনে করিত, আমার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। ঋণ পরিশোধ হইলে যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহার তুলনাও জানি না, পরিমাণও করিতে পারি না। বাল্যকালের সেই সব আনন্দ অপেক্ষাও তাহা বেশী। এ আনন্দের সহিত তুলনায় সে সব আনন্দ অতি সামান্য। সাধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, অঋণী অপ্রবাসী চ ইত্যাদি? এখন আমার প্রবাসও ঘুচিল, ঋণও ঘুচিল। আমার আনন্দ বড় বেশী হইবার কারণ এই যে, আমার ঋণপরিশোধে আমার পত্নী আমার বড় সাহায্য করিয়াছিলেন। আমার যখন ঋণ ছিল, তখন তিনি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে একবার এক যোড়া নূতন কাপড় কিনিয়া দিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন,—তুমি দেবতা সাক্ষী করিয়া আমার চিরকালের ভাত কাপড়ের ভার লইয়াছ;—ও দেবতার দেওয়া কাপড়, দাও, আমি মাথায় করিয়া রাখি। কিন্তু পরিব না। জিজ্ঞাসা করি-

লাম,—পরিবে না কেন? উত্তর,—তোমার দেনা থাকিতে নূতন কাপড় পরিব না। এখন আমার দেনা নাই। তথাপি কিন্তু তিনি রাত্রে মাথায় বালিশ না দিয়া নেকড়ার বোচকা মাথায় দেন, শীতকালে রাত্রে লেপ গায়ে না দিয়া ছেঁড়া মশারি এবং দিনের বেলা কেবল ছেঁড়া কাপড় পাট করিয়া গায়ে দেন। এমন সহধর্ম্মিণী পাইয়াছি বলিয়া অঋণী হইতে পারিয়াছি। একটু চেষ্টা করিলে অনেকে এইরূপ সহধর্ম্মিণী গড়িয়া লইয়া অঋণী থাকিতে পারেন। শাস্ত্রকারেরা বালিকাদের বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ সহধর্ম্মিণী গড়িয়া লইবার সুবিধা হয়।

আমার পত্নী সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য কথা বলিতে বাকি আছে। শিশু সন্তান অধিক কাঁদিলে বা ঘুমাইতে না দিলে প্রায় সকল স্ত্রীলোকই বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে থামাইবার নিমিত্ত—বিশেষতঃ রাত্রিকালে—ঢিপ্ ঢিপ্ বা চটাচট্ মারেন, বা ঠোনা মারেন, বা টিপুনি দেন। তাহাতে তাহারা এমন ককাইয়া ওঠে যে, শুনিলে বড় কষ্ট হয়, এবং সময়ে সময়ে দম বন্ধ হইয়া মারা যাইবে বলিয়া ভয়ও হয়। ইহাতে অশান্তির সীমা থাকে না! আমার সৌভাগ্যবলে ওরূপ অসুখ অশান্তি আমাকে একেবারেই ভোগ করিতে হয় নাই। ছেলেতে মেয়েতে আমাদের ১২টী হইয়াছিল। কোনটির জন্যই আমার-পত্নী

আমাকে দাস বা দাসী নিযুক্ত করিতে বলেন নাই। কেবল অম্লরোগে তাঁহাকে জীর্ণ দেখিয়া আমি আপনিই তাহার দুইটি পুত্রের জন্য দুইটি দাসী নিযুক্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলাম। বাকী সবগুলিকে তিনি স্বয়ং পালন করিয়াছিলেন। পুত্র কন্যা নাতি নাতিনী কাহাকেও তাঁহাকে কখনও দিবাভাগে বা রাত্রিকালে মারিতে দেখি নাই। সকল দেশেই স্ত্রীলোকে ছেলে ঠেঙ্গায়। আমার ঘরে কোনও ছেলেই মার খায় না। ইহা আমার যেমন সুখ ও সৌভাগ্য, আমার ঘরের ছেলে মেয়েরও তেমনি সুখ ও সৌভাগ্য। তবুও কিন্তু ইহাদের অনেকগুলি আমাদের শান্তিময় ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। ইহা তাহাদিগেরই দুর্ভাগ্য, আমার কি আমার শান্তিদায়িনীর দুর্ভাগ্য নয়। আমার স্ত্রীর এই গুণের কথা তাঁহার বড়াই করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম না। স্ত্রীপ্রকৃতিতত্ত্বের একটা রহস্যময় কথা সুধী ব্যক্তি-মাত্রই এবং আমার বিদুষী পাঠিকাগণ বুঝিয়া দেখিয়া বুঝাইবেন, এই আশায় বলিলাম। ইহা যথার্থই স্ত্রীপ্রকৃতি-গত একটা রহস্য। এ রহস্য কেবল আমার ঘরে নাই, অনেক ঘরে আছে, শুনিলে আমার আহ্লাদের সীমা থাকিবে না, আর শিশুকুলের সৌভাগ্যবৃদ্ধিতে শিশু-শিক্ষারও সুবিধা হইবে। যে রমণী শিশুকে মারিতে

পারেন না, বড় রাগ বা বিরক্তি হইলে কেবল একটু বকেন, বোধ হয় দেবতাদের কাছে তাঁহার আদর ও সম্মান কিছু বেশী হয়। এই সমস্ত কারণে আমার পত্নী আমার চির-আরাধ্যা হইয়া আছেন। জামতাড়া হইতে আসিয়া একটু অসুখ হইয়াছিল। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়াছিলাম। তিনি আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিবার পর এ কথা সে কথার মধ্যে বলিয়াছিলেনঃ—আপনা-দের মতন couple (দম্পতী) আমি আর দেখি নাই, আপনাদের কথা আমি অনেকের কাছে বলি। তিনি কিন্তু আমাদের ভিতরের কথা কেমন করিয়া বুঝিলেন, তাহা জানি না—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবও না। আপন ইচ্ছায় বলেন, ত শুনিব।

উপরে লিখিয়াছি যে, বড় অনটনের সময় একবার হাইকোর্টে গিয়াছিলাম। কেন গিয়াছিলাম, এইবার বলিব। এখনও যেমন তখনও তেমনি, ইংরাজী শিখিলে সকল যুবকেরই আদালতের দিকে দৃষ্টি পড়ে—তাহারা বোধ হয় মনে করে যে, আদালতে টাকা ছড়ানো আছে, গেলেই যত ইচ্ছা পাইতে পরা যাইবে। এ বিশ্বাস এখনও আছে, তাই অনেকেই এখনও ওকালতী করিতে যায়। শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অনেকে গড্ডলিকার লক্ষণা-

ক্রান্ত বলিয়া উপহাস করে। আমার বিবেচনায় এরূপ উপহাস অন্যায়। যাহাতে ২।৪ জন কৃতকার্য্য হয় দশ জনের তাহা করিতে যাওয়া সকল দেশেই স্বাভাবিক কার্য্য, অতএব ২।৪ জনকে ওকালতী দ্বারা টাকা উপার্জ্জন করিতে দেখিয়া অনেকেই যে আদালতের দিকে ছোটে, সেটা আমাদের অন্যায় কাজ নয়। আমার কিন্তু মনে হয় যে, আমাদের আদালতে ছুটিবার ইহা অপেক্ষাও একটা গুরুতর কারণ আছে। আমার বেশ মনে আছে যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য যাহা অধ্যয়ন করিতে হইত, তাহাতে স্বাধীন ভাবে কাজ কর্ম্ম বা কারবারের দিকে মন যায়না, এমন কি, একখানা দোকান করিয়া দু' টাকা উপার্জ্জন করিবার প্রবৃত্তিও জন্মে না। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত যে শিক্ষা লাভ করিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ Literary শিক্ষা, তাহাতে কোনও রকম practical প্রবৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে না। প্রধানতঃ এই কারণে আমরা দলে দলে আদালতে ছুটি। National কালেজে নানাবিধ শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। দেখা যাক্ যাঁহারা তথায় পড়িতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একটু practical tendencey দেখা দেয় কিনা। আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ literary শিক্ষা হইয়াছিল বলিয়া আমিও টাকার জন্য হাইকোর্টে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে আমার টাকা

হয় নাই। কেন হয় নাই, পূর্ব্বে বলিয়াছি। অপরের ন্যায় আমারও হাইকোর্টে যাইবার আর একটা কারণ ছিল। স্বাধীন থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিব, চাকরীতে গিয়া পরাধীনতা স্বীকার করিয়া মনুষ্যত্ব নষ্ট করিব না, এই ইচ্ছাই সেই কারণ। এই ধারণাটা যে বিষম ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর ধারণা, তাহা এখন বুঝিয়াছি। চাকরীতে মনুষ্যত্ব যায়, অতএব চাকরী করিব না, Bengal Librarya অধ্যক্ষতা গ্রহণ করাতেই আমার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। অথচ ঐ চাকরী করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরীর কাজ বেশীও নয়, কঠিনও নয়, এক রকম চোখ বুজিয়া বুজিয়া সম্পন্ন করিতাম। সুতরাং কাজের মতন কাজ বলিয়া বোধ করিতাম না। কাজেই চাকরীতে যে ঘৃণা ছিল, ঐ কাজ করাতে তাহা বাড়িয়াই গেল। কিন্তু এই কাজ করিবার পর যে কাজ উপস্থিত হইল, তাহার কঠিনতা ও পরিমাণ দেখিয়া আমার ভয় হইল। তাহা বঙ্গানুবাদকের কাজ। ঐ কাজ করিয়া অসুর Robinson সাহেব বহুমূত্র রোগে মারা গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরে আমার ভ্রাতৃসম অসুরসদৃশ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও ঐ রোগে মারা গিয়াছিলেন। তাই ঐ কাজ লইতে আমার ভয় হইয়াছিল। তাই আমি ঐ কাজের জন্য দরখাস্তও

করি নাই। Croft সাহেবের উপর ঐ কাজের জন্য লোকনির্ব্বাচনের ভার ছিল। তিনি আমাকে নানা রকমে ঐ কাজ লওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমিও অবশেষে লইয়াছিলাম। কাজের মতন কাজ বটে। পরিমাণও যেমন বেশী, প্রকৃতিও তেমনি কঠিন। ইংরাজী আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ কি দুরূহ ব্যাপার, যিনি না করিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন না, বুঝাইলে বুঝিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। অনেককে বঙ্গানুবাদকের অনুবাদের ঠাট্টা করিতে দেখিয়াছি। ঠাট্টা করা যাইতে পারে না, এমন নয়। কিন্তু অনুবাদককে যে সকল নিয়ম পালন করিয়া অনুবাদ করিতে হয়, সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া স্বয়ং বৃহস্পতি অনুবাদ করিলে, তাঁহার অনুবাদেরও যে ঠাট্টা করিতে পারা যায়, ইহা আমি বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি। না জানিয়া না শুনিয়া না বুঝিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করা এখনকার একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বড় বেয়াড়া, বড় দুশ্চিকিৎস্য রোগ। আমরা প্রত্যেকেই এখন ভাবি আমরা সকলের চেয়েই পণ্ডিত, তাই অপর সকলকে ঠাট্টা করিতে কুণ্ঠিত হইনা। অনুবাদকের কাজ লইয়া দেখিলাম—কাজের পরিমাণের যেমন সীমা নাই, উহার প্রকৃতিও তেমনি কঠিন। আর ঐ কাজ করিয়া দিতে বড় তাড়াতাড়ি করিতে

হইত; দুই দিনের কাজ দু' ঘণ্টায় ১০ দিনের কাজ পাঁচ ঘণ্টায়, ইত্যাদি। আদেশমত কাজ সম্পন্ন করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতাম। কখনও একটি কৈফিয়ৎ দিতে হয় নাই। কোনও কাজ করিয়া দিতে একটু বিলম্ব হইলে, যে আপিসের কাজ, সে আপিস হইতে non-official enquiry মাত্র হইত, অর্থাৎ কাজ কত দিনে হইবে জানিয়া যাইবার জন্য একজন কর্ম্মচারী প্রেরিত হইত। কখনও কড়া চিঠি আসিত না। এই কাজ যখন লইয়াছিলাম, তখন গবর্মেণ্টের সহিত সর্ত্ত করিয়াছিলাম যে, ছয় মাস কাজ করিয়া দেখিব, যদি শরীর না বয়, ছয় মাসান্তে লাইব্রেরীর কাজে ফিরিয়া যাইতে পারিব। কাজ কিন্তু এত অধিক ও কঠিন যে, ৩।৪ দিন মাত্র করিয়া আমার মাথা এত ঘুরিয়া ছিল যে, ভয় পাইয়া Croft সাহেবের কাছে গিয়া বলিয়াছিলাম—এ কাজ আমার দ্বারা হইবে না, আমাকে লাইব্রেরীতে ফিরিয়া যাইতে দিন। তিনি আমাকে নিরুৎসাহ করিলেন না, কিন্তু কৌশল করিয়া আমাকে এ কাজে এক মাস রাখিলেন। কৌশল এইরূপ। যে দিন সাহেবের কাছে লাইব্রেরীতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি চাহিয়া আসিলাম, তাহার পর দিন প্রাতে রাধিকা বাবু আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন,—কাল

Croft সাহেবের কাছে গিয়া দেখিলাম, তিনি বড় বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—অমন করিয়া বসিয়া আছ কেন? তিনি বলিলেন,—চন্দ্রনাথের মাথা ঘুরিতেছে, সে Libraryতে ফিরিয়া আসিতে চায়। কিন্তু অনুবাদকের পদের উপযুক্ত লোক আর দেখিতে পাইতেছি না, তাই ভাবিতেছি। তা ভাই, এত শীঘ্র Libraryতে ফিরিয়া গেলে, Croft সাহেবের বড় দুঃখ হইবে, এবং গবর্মেণ্টের কাছে তাঁহাকে অপ্রতিভ হইতে হইবে। তিনি আমাদের হিতৈষী—গবর্মেণ্টের কাছে তাঁহাকে অপ্রতিভ করা আমাদের বড় অন্যায় হইবে। তুমি অন্ততঃ এক মাস এই কাজ কর। রাধিকা দাদার উপদেশ যে বড় সমীচীন, তাহা বুঝিলাম। বুঝিয়া বলিলাম, যতই কষ্ট হউক, এক মাস এই কাজ করিবই করিব। আমাকে এ কাজে এক মাস রাখিলেন। এক মাস এই কাজ করিতে করিতে আমার স্থৈর্য্য আসিল, ধৈর্য্য আসিল, সাহস আসিল, কষ্টসহিষ্ণুতা আসিল, শ্রমে শক্তি বাড়িতে লাগিল, আর এই ধারণা জন্মিল যে, এ কাজ ভগবানের কাজ, গবর্মেণ্টের বা মানুষের কাজ নয়। তখন এই কাজ ভাল লাগিতে লাগিল, আর আলস্য গেল, শ্রমকাতরতা গেল, শ্রমে আনন্দ ও উৎসাহ হইতে লাগিল। সুতরাং তখন ২

দিনের কাজ ১ দিনে ; ১০ দিনের কাজ ৬ ঘণ্টায় শেষ করিয়া এতই আনন্দ হইতে লাগিল যে, প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, চাকরী যদি করি, তবে এইরূপ চাকরীই করিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং ভগবানের চাকরী করিতেছি ভাবিয়া, এই চাকরী করিতে লাগিলাম। তথাপি বুঝিলাম, এ কাজে থাকিলে শীঘ্রই আমার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইবে। Tawney সাহেব তখন Croft সাহেবের কাজ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে ইস্তফা-পত্র পাঠাইয়া দিলাম। তিনি তাহা লইলেন না। আমাকে আরো ছয় মাস থাকিতে বলিলেন। বলিলেন,—আমি লোক পাইতেছি না, তুমি আরো ছয় মাস থাক। আমি গবর্মেণ্টে লিখিয়া তোমার কাজের পরিমাণ কিছু কমাইয়া দিব। তাহাই দিলেন।

তিনি আমার শিক্ষাগুরু, আমি আর না বলিতে পারিলাম না। কাজ যাহা কমাইয়া দেওয়া হইল, তাহাতে আমার নিজের শ্রমের লাঘব হইল না। আমার আপিসের পণ্ডিত মহাশয়ের কিছু আসান হইল। তাহা-তেই সন্তুষ্ট হইয়া আমি কাজ করিতে লাগিলাম। রাত দিন কাজ। রবিবারেও কাজ। প্রতিদিন প্রাতে কাজ। পূজার ছুটীতে আপিস বন্ধ করি, কিন্তু বাড়ীতে কাজ করি। সকল ছুটিতেই তাই। অসুখ হইলেও কাজ

করি, না খাইয়াও কাজ করি। কাজ আমার জপমালা হইয়াছিল।

দুইবার ছুটী লইয়া হাওয়া খাইতে মধুপুরে ও বৈদ্যনাথে গিয়াছিলাম—কিন্তু সেখানেও রাশি রাশি কাজ করিতে হইয়াছিল। ইং ১৯০১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরেশনাথের পরলোক হয়। কলিকাতার বাড়ীতে আর কেহ থাকিতে পারে না। এই কথা শুনিয়া প্যারী দাদা (রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়) আমাদিগকে যেন কোলে তুলিয়া লইয়া তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ সুন্দর বাটীতে লইয়া গিয়া বসাইয়া দিলেন, এবং সপরিবারে আমাদের অশেষ আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। সে আদর যত্ন আমরা ভুলিতে পারিব না। আমাকে প্রাতে তাঁহার কাছে গিয়া কাজ করিতে দেখিয়া, তিনি বলিলেন, এখানে আসিয়াও নিষ্কৃতি নাই? আমি কোনও উত্তর করিলাম না, কিন্তু মনে মনে বলিলাম,—"ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" কাজ ছাড়িয়া দিব শুনিয়া আমার এক বন্ধু (আহা, তিনি আর ইহলোকে নাই!) এক জন মহামহোপাধ্যায়, আমাকে বলিয়াছিলেন,—সংবাদপত্রের রিপোর্ট অত বেশী করিয়া নাই লিখিলেন, কম করিয়া লিখিলে কেহ ত ধরিতে পারিবে না। এমন কাজটা ছাড়িবেন কেন? আমি বলিলাম, তা

আমি পারিব না। আর কেহ ধরিতে পারিবে না বটে—কিন্তু আমার মন যে আমাকে ধরিবে। ফলতঃ ভগবানের কাছে অপরাধী না হই এমন করিয়া কাজ করিয়াছিলাম বলিয়াই এত দিন এই কঠিন কাজ আমার নিজের সন্তোষজনকরূপে করিতে পারিয়াছিলাম। এবং পেন্সন লইবার পর Croft সাহেবকে এইরূপ লিখিতে পারিয়াছিলাম—Looking backward, I cannot call to mind a single item of work, big or small, regarding which I could now wish that, given the time and the staff, I had done it better or more carefully. না, আমার মনের কোথাও কিঞ্চিন্মাত্র আত্মগ্লানি নাই। বিধাতা পুরুষ স্বয়ং অনুসন্ধান করিলেও আমার কাজে অমনোযোগ, অসাবধানতা, বা অবহেলার নিদর্শন খুঁজিয়া পাইবেন না। কেমন করিয়া পাইবেন, আমি যে তাঁহারই চাকরী করিতেছি ভাবিয়া গবর্মেণ্টের চাকরী করিয়াছিলাম। সকলকেই বলি,—বিধাতার চাকরী করিতেছ ভাবিয়া যাহার ইচ্ছা তাহার চাকরী করিও, চাকরীতে হীনতা দেখিবে না, গৌরবই দেখিবে, আর নিখুঁত কাজ করিয়া ও ধার্ম্মিকের ন্যায় কাজ করিয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে, এবং নির্ম্মল, অক্ষয়, পবিত্র সুখ ভোগ করিবে, তাহার তুলনা পাইবে না।—বলিতেও ভয়

করে, কিন্তু না বলিয়াও থাকিতে পারি না, সচ্চিদানন্দের আনন্দ বুঝি সেই প্রকৃতির আনন্দ। অনুবাদককে বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের রিপোর্ট গবর্মেণ্টকে প্রতি সপ্তাহে দিতে হয়। ৬০।৭০ খানা কাগজ স্বয়ং অনুবাদককে আদ্যোপান্ত পড়িয়া রিপোর্ট করণার্থ চিহ্নিত করিয়া দিতে হয়। সহকারীরা চিহ্নিত অংশগুলির রিপোর্ট লিখিলে অনুবাদক স্বয়ং তাহা পড়িয়া ও মূলের সহিত মিলাইয়া আবশ্যক মত সংশোধন করিয়া দেন। কোনও কোনও কাগজে বলা হয় যে, সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনেক সময় ঠিক হয় না, এবং গবর্মেণ্টের মনে সেই জন্য সংবাদপত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত বা অযথা ধারণা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্ট যে কত সাবধানতার সহিত প্রস্তুত করা হয়, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। উহা ভাল না হইলে অধর্ম্ম হইবে—উহাতে দোষ বা ত্রুটী হইলে অনুবাদকের ইহকাল পরকাল নষ্ট হইবার সম্ভাবনা—এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সংবাদপত্রের রিপোর্ট করা হয়। আমি সতের বৎসর রিপোর্ট করিয়াছি—একটিও অযথা রিপোর্ট করিয়াছি বলিয়া আমার মনে কাঁটা বেঁধে না। বড় আদালতে আমার অনুবাদের ফড়া ছেঁড়া হইয়াছে, তথাপি আমাকে আঘাত পাইতে হয় নাই। লেখকেরা আপনারা দোষ করিয়া অনুবাদকের

ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজেরা নিষ্কৃতি পাইবার অসাধু চেষ্টা করিয়া থাকেন। তবে অনুবাদকদের যে একটিও ভুল হয় না, এমন কথাও বলি না। হয় বই কি, বিশেষ Slang বাঙ্গালায় বা খ্যাচড়া বাঙ্গালায় লেখা কাগজের অনুবাদে ভুল হইবার বড়ই সম্ভাবনা। তবে দৃঢ়তাসহকারে বলিতে পারি যে, নিরতিশয় সাবধানতাসহকারে রিপোর্ট করিলেও অমন ভুল হইয়া থাকে। সকল দেশেই হয়, সকলেরই হয়। তজ্জন্য অনুবাদককে গালি দেওয়া বা ঠাট্টা করা অতি অন্যায়, এবং অসজ্জনতার কাজ। এক জন সংবাদপত্রলেখক আপন সম্পাদিত কাগজে বাঙ্গালার ঠিক ইংরাজী অনুবাদ হইতেই পারে না ইহা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

চাকি ডুবু ডুবু (আর মনে নাই)

করুক দেখি কে ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে পারে? আমি ইহার অনুবাদ করিয়াছিলাম :—

চাকি ডুবু ডুবু—the sun's disc is about to sink.

যাহা মনে নাই, তাহারও অনুবাদ করিয়াছিলাম। অনুবাদ অসাধ্য হইয়াছিল, এরূপ মনে হয় না।

ফল কথা, ইংরাজীতে একটু অধিকার না থাকিলে বাঙ্গালার, বিশেষতঃ নীচতাদুষ্ট (slang) বাঙ্গালার ঠিক

ইংরাজী অনুবাদ করিতে পারা বড়ই কঠিন। কিন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্রে আজ কাল নীচতাদুষ্ট বা slang বাঙ্গালার প্রাদুর্ভাব বড় বেশী। ইহার এই ফল হইয়াছে যে, এখনকার বাঙ্গালী সকল দিকেই মর্য্যাদাহীন এবং অভদ্র হইয়া পড়িতেছে এবং সংবাদপত্র গবর্মেণ্টের বোধগম্য হইতেছে না বলিয়া গবর্মেণ্ট আমাদের মনের কথা বুঝিতে পারিতেছেন না, এবং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ বাড়িতেছে। সংবাদপত্রে অভদ্র বা নীচতাদুষ্ট বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে সাধু ভাষার ব্যবহার বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। নহিলে আমরা অভদ্র (ungentlemanly) হইয়া উঠিব। ইহারই মধ্যে অভদ্র বা ungentlemanly হইয়াছি।

স্বভাব অভদ্র বা নীচ হইলে ভাষাও ভদ্রোচিত হইতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এই যে অভদ্রোচিত ভাব এত প্রবল হইতেছে ইহা আমাদের ভয় ভাবনার কারণ সন্দেহ নাই। নীচতাদুষ্ট রচনা অবিলম্বে পরিত্যক্ত হওয়া আবশ্যক। এখন অনেকেই চলিত বা colloquial বাঙ্গালার পক্ষপাতী হইয়াছেন। ইহা দোষের কথা নয়। ভাষা colloquial না হইলে সাহিত্য মূর্খের আয়ত্ত বা বোধগম্য হয় না; সুতরাং সমস্ত লোকের সমান হিতকর হয় না। কিন্তু colloquial বাঙ্গালা লিখিবার

একটা বিষম দোষও আছে। colloquial বাঙ্গালা লিখিতে লিখিতে slang বাঙ্গালা আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ নীচতাদুষ্ট বাঙ্গালা আসিয়া পড়ে। আমাদের মধ্যে আসিয়াছেও তাই। সেই জন্য অনেক বাঙ্গালা সংবাদপত্র পড়া অনেক সুশিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোকের অতিশয় বিরক্তিকর, এমন কি, ঘৃণাজনক হইয়া পড়িয়াছে, এবং সমস্ত সমাজে একটা নীচতাপ্রিয়তা জন্মিয়া গিয়াছে। ইহার সংস্কার সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এইরূপ এবং অন্যান্য কারণে অনেক বাঙ্গালা সংবাদপত্রে আমাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইতেছে। এই অনিষ্ট নিবারণ করা বড় আবশ্যক। এ বিষয়ের অধিক আলোচনা এখানে হইতে পারে না। স্থানান্তরে ও সময়ান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই কঠিন কাজ সতের বৎসর করিয়াছিলাম। তাহার পর পেন্সন লইয়া চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করি। এমন কঠিন চাকরী এত দীর্ঘকাল করাতেও কিন্তু আমার অন্তরাত্মা বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল সাক্ষ্য দিয়া আমাকে কখনও কষ্ট বা যন্ত্রণা দেন নাই। বরং অনুকূল সাক্ষ্য দিয়া আমাকে আশ্বস্তই করিয়াছেন। যদি কেহ বলেন যে, আমার অন্তরাত্মা আমার নিজের লোক, আমার দিকে টানিয়া কথা কহিবেন ইহা বিচিত্র নয়।

তাঁহাদের বিশ্বাস হইতে পারে, এই আশায় আমার অন্তরাত্মার সাক্ষ্যের অপর অনুকূল বা পোষক সাক্ষ্য (corroborative evidence) দিতেছি। আমি ৩৫ বৎসর বয়সে চাকরীতে গিয়াছিলাম, পেন্সন আইনানুসারে আমার ১৭৫৲ টি টাকা পেন্সন প্রাপ্য হইয়াছিল। তাহাতে আমার সংসার চলিবে না বলিয়া আমি special বা অতিরিক্ত পেন্সনের দরখাস্ত করিয়াছিলাম। আমার কাজকর্ম্ম দেখিয়াছিলেন, এমন অনেক বড় বড় কর্ম্মচারীর অভিমত ঐ দরখাস্তের সঙ্গে দিয়াছিলাম। অতিরিক্ত বা special pension ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমতি ভিন্ন হইতে পারে না। বেঙ্গল গবর্মেণ্ট ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টকে পত্র লেখেন, এবং ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারীকে পত্র লেখেন। সেই সকল পত্র এবং কর্ম্মচারীদিগের অভিমত হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম :—

The work of the Bengali Translator requires capacity of a high order, good judgment, and scrupulous fairness. All these qualities have been continuously exhibited by Babu Chandra Nath Bose. The selecting of passages for translation from the various vernacular newspapers makes large demands

upon the discretion and good faith of the officer entrusted with the work; and in this important matter this officer has rendered very marked services to Government. —বেঙ্গল গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী আরল্ সাহেবের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

We agree with the Government of Bengal in its estimate of the high qualities required for the efficient conduct of the duties of its Bengali Translator, and in its appreciation of the loyalty and ability with which Babu Chandra Nath Bose has discharged those duties. * * * In the performance of both these ordinary and these special duties, Babu Chandra Nath Bose has displayed great ability and fairness, sometimes at the cost of much obloquy from his countrymen—সুপ্রীম কৌন্সিলের সদস্য অ্যাম্পাথিল, কিচেনার, ল, এলিস্, অরণ্ডেল, ইবেট্সন্ ও রিচার্ড সাহেবদিগের স্বাক্ষরিত পত্র হইতে উদ্ধৃত।

They were always faithfully and efficie-

ntly dischaged, and his work was ever animated by a deep sense of responsibility and distinguished by conscientious accuracy—কটন সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

In the delicate and difficult duties that you have to discharge as Translator to Government, and especially in that branch of your work which deals with the weekly report on the vernacular newspapers, you have displayed equal judgment and fearlessness. The annual and other special reports that you have from time to time submitted on this subject have shown remarkable insight into the currents of thought and feeling which sway the writers in the vernacular press, and have elicited the warm commendations of Government, to whom they afforded material help.

Your personal character for independence and probity stands so high that it is quite needless for me to do more than

refer to it.—শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার ক্রফ্‌ট সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

I was delighted to hear from your letter of the 4th August that the Government had granted you a special pension. No man has deserved it better than you, and I offer you my hearty congratulations. It is not the amount that I value, but the recognition of thoroughly good and scholarly work continued for many years.—ক্রফ্‌ট সাহেবের লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত।

I know nothing but good of your work and have several times had occasion to notice that it was faithfully and conscientiously done.—ম্যাক্‌ফার্সন সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

I have always had the highest opinion of your ability and trustworthiness; and I belive that Sir John Edgar held the same opinion.

Your office as official translator is one

of very considerable difficulty and delicacy. You have not escaped attacks by some newspapers from time to time for doing your duty loyally to Government.—লুসন সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

I have much pleasure in testifying, as you ask me, to the able and conscientious manner in which you always discharged your duties in the responsible post of translator to Government while I was Under Secretary to Government in the political and Judicial departments. * * * Your retirement will be a loss to the Government in my opinion. ওল্‌ডহাম সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

Your work as Bengali translator always seemed to me excellent, ক্লাগস্টন সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

এই সকল অভিমত পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, এত দিন এই কঠিন কাজ করিয়াছিলাম, কিন্তু অধর্ম্ম করি নাই, গবর্নেণ্ট এবং বড় বড় কর্ম্মচারী সকলেরই এই ধারণা,

এবং সেই জন্য সকলেই আমার উপর সন্তুষ্ট। এই জন্যই ত আজ আমার সুখ এত নির্ম্মল, এমন অবিনশ্বর। এ সুখের হ্রাস নাই। এ সুখে তরঙ্গ নাই। এ সুখের বিনাশ নাই। আমি হাসি, কাঁদি, দুঃখ পাই;—কিন্তু সবই আমার সেই নিত্য নির্ব্বিকার সুখরূপ জমীর উপর করি। যেমন একই বস্ত্ররূপ জমীর উপর নানাবিধ ফুল প্রভৃতি তোলা হয়, তেমনি আমার এই অনন্ত সুখ-রূপ জমীর উপর হাসি কান্না সবই ফোটে। তাই ত মনে হয়, সচ্চিদানন্দের বুঝি এই প্রকৃতির আনন্দ। ধর্ম্ম-জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং যতদূর সাধ্য প্রবল রাখিয়া কঠিন চাকরী করিয়া আমি অক্ষয় ও অনন্ত সুখের অধি-কারী হইয়াছি। কিন্তু দু' দিনের জন্য স্বাধীনতা কলা-ইতে গিয়া যে আত্মগ্লানি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা এখনও যায় নাই; বোধ হয়, এ জীবন থাকিতে যাইবে না। কেবল চাকরীর এই সুখে উহা কতকটা চাপা পড়ি-য়াছে। কিন্তু কঠিন দায়িত্বপূর্ণ চাকরী করিয়া এই যে চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করিয়াছি, ইহার অপেক্ষাও একটা বড় ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। সে ফলের নাম discipline —নিয়মানুবর্ত্তিতা। এই কঠিন চাকরী করিতে করিতে যেমন স্থৈর্য্য আসিয়াছিল, ধৈর্য্য আসিয়াছিল, কষ্ট-সহিষ্ণুতা আসিয়াছিল, তেমনি আলস্য, অস্থিরতা,

শ্রমকাতরতা, চঞ্চলতা প্রভৃতি দোষ কাটিয়াগিয়াছিল। সংসার-যাত্রায় ঐ সকল গুণও যেমন আবশ্যক, ঐ সকল দোষের পরিহারও তেমনি প্রয়োজনীয়। নহিলে সংসার-যাত্রায় বিপদ বিভ্রাট অশান্তি অমঙ্গলের সীমা থাকে না। অর্থাৎ কঠিন চাকরী কঠোর ভাবে সম্পন্ন করিলে, মনুষ্যোচিত গুণ আপনা-আপনিই জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ, অপক্ক মানুষ পরিপক্ক হয়। অপর দিকে পরিপক্ক মানুষ স্বাধীনতা ফলাইতে গেলে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কঠিন চাকরীতে মানুষ গড়ে, স্বাধীন ব্যবসায় মানুষকে নষ্ট করে। এমন কঠিন কাজ যে সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলাম তাহার প্রধান কারণ এইযে, আমার সহকারীরা, নারায়ণ চন্দ্র, রাজেন্দ্র চন্দ্র, বিধুভূষণ, মন্মথ নাথ, জ্ঞানেন্দ্র লাল, প্রবোধ প্রকাশ সকলেই ভক্তের ন্যায় প্রাণপণে আমার সহকারিতা করিয়াছিলেন। প্রবোধ প্রকাশ অল্পবয়সে আমাদিগকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভগবান অপর সকলের মঙ্গল করুন।

এই স্থানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। আমার সহকারীদের ছুটী লওয়া আবশ্যক হইলে তাঁহাদের পরিবর্ত্তে কার্য্য করিবার নিমিত্ত আমি ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনের প্রথম শ্রেণীর এম্, এ. উপাধিধারী নিযুক্ত করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী করিতে এবং

ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা করিতে সমান অপটু। ১৭ বৎসর অনুবাদকের কর্ম্মে থাকিয়া অস্থায়ীরূপে নিযুক্ত কেবল তিনটী ছেলেকে ভাল ইংরাজী লিখিতে দেখিয়াছিলাম—(১) আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্তের পুত্র প্রবোধপ্রকাশ সেন গুপ্ত (২) প্রখ্যাতনামা রাখাল দাস হালদার মহাশয়ের পুত্র সুকুমার হালদার এবং আমার সহপাঠী ৺উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অকালমৃত পুত্র যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের literary education এ literary যোগ্যতাও বেশী হয় না।

প্রকৃত অধীনতা চাকরীতে নাই। উহাতে হীনতাও নাই। হীন কাজ না করিলে কিছুতেই হীনতা নাই। আমাকে একবার একটা হীনকাজ করিতে বলা হইয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ ফোঁস করিয়া উঠিয়া একটা চোবল মারিয়াছিলাম। আর আমাকে কেহ কখনও হীন কাজ করিতে বলিতে সাহস করে নাই। ওকালতীতে টাকার গোলামী করিতে হয়—চাকরীতে তাহা হয় না। টাকার গোলামী সকল গোলামীর অধম। ৫।৬ বৎসর হইল, কলিকাতার দুই জন সম্ভ্রান্ত আইনব্যবসায়ী অধিকন্তু ধনীলোকও বটে, আমাকে বলিয়াছিলেন,—আর দু'বছরের বেশী এ ব্যবসা চালাইব না—কিন্তু এখনও চালাইতেছেন। আমি পেন্সন লইবার পর ভাই

রাসবিহারী আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, you acted wisely in leaving the legal profession আমি এখনও chained like a galley-slave। তাই বলি, চাকরীতে সুখও যেমন, স্বাধীনতাও তেমনি, আর discipline শিক্ষা হয় বলিয়া মনুষ্যত্বের উন্নতিও তেমনি; ওকালতীতে অনেকের পক্ষে অধীনতাই বেশী এবং মনুষ্যত্বের অপলাপ হয় ও প্রতিবন্ধক ঘটে।—স্বাধীনবৃত্তিরূপ মাকাল ফলের প্রয়াসী হইয়া সুখ শান্তি মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সমস্ত স্পৃহণীয় পদার্থে জলাঞ্জলি না দিয়া ধর্ম্মজ্ঞানে কঠিন দায়িত্বপূর্ণ চাকরী করিও। ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা আপনাদের অভাব আপনারা মোচন করিতে পার, অগ্রে তাহাই করিও, তাহা না পার, চাকরী করিও। সচ্চিদানন্দের আনন্দের আস্বাদ পাইবে, সংসারযাত্রার সুচারু নির্ব্বাহ যে সকল গুণ না থাকিলে হয় না, তাহা লাভ করিবে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে, এবং প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিবে।

এই অনুপম আনন্দে এখন আমার দিন কাটিতেছে! শোক দুঃখ আমার আছে, বিশেষতঃ আমার দুলুমায়ের বিয়োগবশতঃ। কিন্তু যখন ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া থাকি, আর আমার সহধর্ম্মিণী নিঃশব্দে আমার অজ্ঞাতসারে আমার ঘরে আসেন, বলিতে পারি না, কেমন করিয়া

আমার বিষণ্ণতা আমার অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যায়। অক্ষয়-কুমার আমাকে আর এক দিন দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন,—আপনার জোরে তিনি আছেন; তাঁর জোরে আপনি আছেন। এত গুপ্ত কথা অক্ষয় কেমন করিয়া জানিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু কথা বড়ই সত্য। বাল্যকাল হইতে শুনিয়াছি, স্ত্রীই পুরুষের শক্তি —শিবের শক্তি শিবানী,ব্রহ্মার শক্তি সাবিত্রী,বিষ্ণুর শক্তি রমা। শুনিতাম, কিন্তু বুঝিতাম না। এখন বুঝিয়াছি। বুঝিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কৃতার্থ হইয়াছি এই জন্য যে, আমরা সকলেই ত শক্তির সৃষ্টি করিয়া লইয়া সুখশান্তির অধিকারী হইতে পারি। এখন বুঝিয়াছি, প্রেম ফ্রেম বড় কাজের কথা নয়, এক মুহূর্ত্তে হয়, এক মুহূর্ত্তে যায়। ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহাতে তেমন কাজ হয় না। ভক্তির অভাবে প্রেম পবিত্র হয় না, সুতরাং সমাজের প্রকৃত মঙ্গলজনকও হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার প্রেম ভক্তিমূলক, রামচন্দ্রের সহিত সীতার প্রেম ভক্তিমূলক, দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার প্রেম ভক্তিমূলক, পাণ্ডবদের সহিত দ্রৌপদীর প্রেম ভক্তি-মূলক, দার্শনিক মিলের সহিত কুমারী হেলেন টেলরের প্রেম ভক্তিমূলক। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ণিত প্রেম ভক্তিমূলক নয়, লালসামূলক। বাঙ্গালা কবিতা

ও উপন্যাসে ভক্তিমূলক প্রেম বর্ণিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্য সাহিত্যের মধ্যে উচ্চতম ও অদ্বিতীয় হইবে।

চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে বাল্যকালের যে সকল কথা এবং অধিক বয়সের হিতৈষীদিগের যে সকল কথা মনে উঠিয়া মন সুখে ও আনন্দে ভরাইয়া দেয়, অনেকেরই ভাগ্যে সেরূপ ঘটনাদি হইয়াছে এবং হইয়া থাকে। অতএব পৃথিবীতে সুখ বা আনন্দ নাই বলিয়া কাহারও দুঃখ করিবার বা বিধাতার উপর দোষারোপ করিবার কারণ নাই। এই যে এখন একটা সুর উঠিয়াছে যে জগৎ দুঃখময়, ইহাতে সুখ নাই—এটা মানবের ঘোর দুর্ম্মতির ফল। ইহাতে মানুষকে ঈশ্বরে অনাস্থাবান করিয়া জগতে ঈশ্বর পরায়ণতার খর্ব্বতা করিতেছে। ঈশ্বরপরায়ণতার খর্ব্বতাতে শুধু নাস্তিকতা বাড়ে তা নয় স্বার্থপরতা এবং মানবের মধ্যে অসদ্ভাবও ঘটে। চক্ষু বুজিয়া reverieতে যেরূপ পুরাতন কথা পাইয়া এত সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিয়াছি এবং করি, বিনা আয়াসে সকলেই সেইরূপ পুরাতন কথা পাইয়া অতুলনীয় সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। এখন বোধ হয় বলিতে পারি যে, ইংরাজীতে যাহাকে reverie বলে বাঙ্গালায় তাহাকে রোমন্থন বলিলে ভুল করা হয় না। রোমন্থক জন্তুদিগের রোমন্থনের প্রকৃতি দেখিলে

বোধ হয় প্রথম গ্রাস অপেক্ষা রোমন্থনের গ্রাস তাহাদের বেশী মিস্ট লাগে। আমিও দেখিলাম, বাল্যকালের সেই আনন্দ অপেক্ষা বৃদ্ধ বয়সের সেই আনন্দের রোমন্থন বেশী আনন্দজনক। কিন্তু বাল্যকালে আমি গ্রামে থাকিয়া যেরূপ আনন্দোপভোগ করিয়াছিলাম, এখনকার ছেলেদের সেরূপ আনন্দোপভোগের আর উপায় নাই। কারণ ম্যালেরিয়া প্রভৃতির জন্য পল্লীবাস আর আমাদের নাই বলিলেই হয়। সুতরাং আমাদের ছেলেদের পল্লীজীবনও নাই। পল্লীজীবনের অভাবে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা বোধ হয় এখন আর কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না।

সহর ছাড়িয়া যাহাতে আবার পল্লীতে বাস করিতে পারি অপর সমস্ত কাজ ফেলিয়া রাখিয়া আমাদের সকলেরই এখন প্রাণপণে সেই চেস্টা করা আবশ্যক হইয়াছে। এ চেষ্টা ফলবতী করিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে। কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক সকলে ভাবিয়া দেখুন। ম্যালেরিয়ার সহিত সংগ্রাম আমাদিগকেই করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট করিবেন মনে করিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। গ্রামে গ্রামে গিয়া সকলকে এই কথা বুঝাইতে হইবে এবং এই কাজে

প্রবৃত্ত করিতে হইবে। একাজের সহিত রাজনীতি জড়ান হইবে না। জড়াইলে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এ কাজ করিতে দিবেন না। এখন ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ। এই কাজ করিবার সামর্থ্য লাভের জন্য স্বদেশীর যত প্রয়োজন, উদরান্নের জন্যও তত প্রয়োজন নয়। যাহাদের উদরান্ন আছে তাহারাও যে ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবেই এখন আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। ভাল পানীয়জল পাইলে সকল রোগেরই উপশম হইবে, ম্যালেরিয়াও কমিবে। যাহাতে গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয়জলের সংস্থান হয় এবং বদ্ধজল নিকাশের উপায় হয় সকলের সমবেত চেষ্টায় সেই কাজ করাই আমাদের এখন সর্ব্ব প্রধান কাজ। সে কাজের জন্য যদি স্বদেশীও একটু চাপা রাখিতে হয় তাহাও করিতে হইবে। কারণ এক সঙ্গে দুইটা বড় কাজ করিবার শক্তিসামর্থ্য আমাদের নাই। আমাদিগকে একটা একটা করিয়া কাজ করিতে হইবে।

পৃথিবীতে সুখের যদি সীমা নাই তবে কি তথায় দুঃখ নাই? আছে বৈ কি, খুবই আছে। লোকমধ্যে সেই জন্যই সুখের পিপাসা এত প্রবলা এবং সুখের অনুসন্ধানে কাহারো বিরাম নাই। কিন্তু যিনি অসীম সুখের ব্যবস্থা

করিয়াছেন তিনি এত দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন কেন? তিনি কি তবে নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয়? অনেকে তাই বলেন বটে। সেদিন বৈকালে একটী ভিখারী বালক "দয়াময়ি! কোন্ গুণে তোমায় দয়াময়ী বলে" অতি করুণ কণ্ঠে এই গানটী গাহিয়া আমায় কাঁদাইয়া গিয়াছিল। তেমন কান্না অনেককেই কাঁদিতে হয়। এমন দয়াময় এমন নির্দ্দয় কেন, এত কাল বুঝি নাই। রোগ যন্ত্রণা দেখিয়া ও ভুগিয়া এবং গোটাকতক শোক পাইয়া বুঝিয়াছি যে দুঃখেই বিধাতার পরম কৃপার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, বুঝিয়াছি যে দুঃখের ন্যায় সুখ আর নাই। আমাদের তুলুমার শোকে আমরা পতি পত্নী বড়ই কাতর। কিন্তু সেদিন আমার পত্নী বলিতেছিলেন—"সে থাকিতে তাহার যে সব কথা মনে হইত না, এখন তাহা মনে হয়।" ঠিক কথা, শোকে স্মৃতি শক্তি বাড়াইয়া দেয়। তাইত শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে আমার সেই মায়ের কথা ভাবিতে যত সুখ হয়, বোধ হয় মা আমার চিতা ভস্ম হইতে উঠিয়া আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইলেও তত সুখ হইবে না। তাই বলি, শোকের ন্যায় সুখ আর নাই। এবং সেই জন্য পুত্রশোকাতুরা নিরক্ষরা বঙ্গীয়া জননীর ক্রন্দনে এত করুণা ও কবিত্ব নির্গত হয় এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শোকের কথায় এত নৈপুণ্য বা চমৎকারিত্ব

দৃষ্ট হয়। শোকমগ্ন মানব মানবীর শোকের কথা ভিন্ন অন্য কথা ভাল লাগেনা, অন্য কথায় তাঁহারা বিরক্ত হন। তাঁহাদের ধ্যান বড় গাঢ় ও গূঢ়—তেমন সুখ এক জগদম্বার ধ্যান ভিন্ন অন্য কোন ধ্যানে আছে কিনা সন্দেহ। আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, দুঃখের ন্যায় পবিত্র বস্তু আর নাই—আর পবিত্রতম বলিয়াই ইহার ন্যায় সুখকর ধ্যানও নাই। কেন একথা বলিলাম এখনই বুঝিবে। আর একটা কথা। দুঃখ না থাকিলে জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভাল লাগেনা। নিছক মিষ্ট বোম্বাই আঁব নির্বীর্য্য বালকের ভাল লাগে; কিন্তু বীর্য্যবান বয়স্কের অম্লমধুর ন্যাংড়াই রুচিকর। দিন রাত তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিলে তাকিয়া কণ্টকের বস্তা হইয়া উঠে। জীবনের পথ দুরূহ না হইলে জীবনযাত্রা সুখকর হয় না। সহজ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৃপ্তি হয় না। কঠিন প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে পরীক্ষা দিয়া সুখ ও গৌরব বোধ হয়। জীবনযাত্রায়ও তেমনি যদি নানা দুঃখ কষ্টে পড়া যায় এবং সেই সব দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করিয়া ওঠা যায় তবেই দেখা যায় যে, মনের বল বাড়িয়াছে এবং যাহাকে মনুষ্যত্ব বলে তাহারও উন্মেষ হইয়াছে। এবং

মনুষ্যত্বের উন্মেষ হইলে সকল দিকেই উন্নতি সম্ভব হয়। তোমার একটী ছেলের জ্বর বিকার চলিতেছে। তুমি নানা বিভীষিকা দেখিতেছ। যদি অধীর অস্থির ভীতিবিহ্বল হও তবে চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটাইয়া নিশ্চয়ই তোমার বিপদ বাড়াইয়া ফেলিবে। কিন্তু যদি ধৈর্য্য স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়া চিকিৎসা বিভ্রাট না বাধাও তাহা হইলে বিপদে তুমি কূল পাইবে। এইরূপে বিপদে কূল পাইতে হইলে মনের যে শক্তির প্রয়োজন তাহা লাভ হইলে যে মানুষ নয় সেও মানুষ হইয়া যায়। শোকে মানুষকে বিহ্বল করিয়া থাকে। কিন্তু শোকে সংযত ও অবিচলিত থাকিতে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন তাহা লাভ হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়। তাই বলি দুঃখ কষ্টে মানবের পরম মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে। অতএব দুঃখ কষ্ট পাইতে হয় বলিয়া বিধাতাকে গালি দিওনা বা তাঁহার নিন্দা করিওনা। বিধাতা অমঙ্গল হইতে মঙ্গল আনিয়া দেন। তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম! কঠিন ও কঠোর না হইলে শক্তিশালী হওয়া যায় না; মনুষ্যত্ব লাভে অক্ষম হইতে হয়। দুঃখ কষ্টে স্থির ধীর ও অবিচলিত থাকিতে হইলে কঠিন ও কঠোর হইতে হয় নহিলে ভাঙ্গিয়া পড়িতে হয়। দুঃখে মানুষ গঠিত হয়, সুখে মানুষ এলাইয়া যায়। যীশুখৃষ্ট বড়

কষ্ট সহিয়াও, শত্রুর জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া আধখানা পৃথিবীর আরাধ্য দেবতা হইয়া আছেন। সীতা দেবী বিষম কষ্ট সহিয়াছিলেন তাই আজ সমস্ত পৃথিবীর আদর্শ রমণী। শ্রীরাম চন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ অম্লান মুখে চৌদ্দবৎসর বনবাস কষ্ট সহিয়া ছিলেন বলিয়া চিরকাল মানবের মধ্যে প্রধান পুরুষ হইয়া আছেন ও থাকিবেন। যুধিষ্ঠিরা-দির এত যে গৌরব সেও সেই জন্য। মানবের হিতার্থই বিশ্বে বিধাতার দুঃখের সৃষ্টি। দুঃখ ভোগ করিতে শেখ, দুঃখ অতিক্রম করিবার শক্তি যাহাতে জন্মে তাহা কর, মানুষ হইয়া যাইবে। আমার মধ্যম জেঠা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবন চন্দ্র বসু প্রথমে ট্রেজ-রিতে ৮০ টাকা বেতনের চাকরি করিয়াছিলেন। তদ-পেক্ষা বেশী বেতনের একটা চাকরী খালি হইলে, সাহে-বেরা তাঁহাকে তাহা না দিয়া আর এক জনকে দিয়া ছিলেন। বৃন্দাবন দাদা রাগ করিয়া চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে আমাদের সংসারের বড় কষ্ট হইয়াছিল। আমার পিতা তখন আমাদের সংসারের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন দাদাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাদা এক বন্ধুর কাছে কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া কণ্ট্রাক্টের কাজ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে

কিন্তু তাঁহার লোকসান হইল। তখন তাঁহার দুরবস্থার সীমা রহিল না। তিনি অজ্ঞাত বাস আরম্ভ করিলেন। কোথায় ছিলেন আমরাও জানিতে পারি নাই। বোধ হয় সেই সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ধনাঢ্য না হইলে লোকালয়ে আর মুখ দেখাইবেন না। হইলও তাই। তিনি বড় বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী মানুষ ছিলেন তাঁহার বন্ধু ছিলেন আমার আচার্য্যদেব শক্তি উপাসক শক্তিশালী ভূদেব মুখোপাধ্যায়। অজ্ঞাত বাসের ২।১ বৎসর পরেই বৃন্দাবন দাদা কৃতী লোক বলিয়া কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কষ্টে পড়িয়া তাঁহার মানসিক শক্তির অসাধারণ বিকাশ হইয়াছিল—সেইজন্য যে কাজে হাত দিতেন তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতেন। সেইজন্যই ত যখন আউধ ও রোহিলখন্দ রেলপথ প্রস্তুত হইতেছিল তখন ডাক্তার মেক্রে (Dr. Alexander Macrae) বৃন্দাবন দাদাকে অংশীদার করিয়া ঐ রেলপথ নির্ম্মাণার্থে দ্রব্য সরবরাহের জন্য Alexander Bose & Co.—এই নামে রাধাবাজারে হৌস করিয়াছিলেন। এই জন্য আমার শক্তিশালী আচার্য্য এবং বৃন্দাবন দাদা হরিহরাত্মা হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুঃখ কষ্টে পড়িলে বিধাতাকে গালি দিও না, বৃন্দাবন দাদার মত দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করিবার শক্তি সঞ্চয়

করিও, মানুষ বলিয়া গণ্য হইবে। যে মাজি বার বার তুফানে পড়িয়া নৌকা রক্ষা করিতে পারে সেই পাকা মাঁজি হয়। যে মাজি কখনও তুফানে পড়ে না সে কাঁচা মাজি—তাহার নৌকায় উঠিতে সাহস হয় না। সংসারের তুফানে ভীত না হইয়া শক্ত করিয়া মনের হাল ধরিয়া থাকিও, দেখিবে তুফান ঠেলিতে কত সুখ! কত আনন্দ! পৃথিবীতে অসীম সুখত আছেই, আবার যে দুঃখ আছে তাহাতেও কি উচ্চ আনন্দ! এমন পৃথিবী কি আর হয়! আর তুফান ঠেলিতে ঠেলিতে জীবনযাত্রা যখন শেষ হইয়া আইসে তখন উহা কেবল ছেলে খেলা হয় নাই ভাবিয়া কৃতার্থ হইতে হয়।

দুঃখের আর এক ব্যাপক মূর্ত্তি আছে। কিন্তু সে রূপ দেখা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। আত্ম পর ভেদ না ভুলিলে তাহার কল্পনাও হইবে না। সাধনা বলে যাঁহারা লোকাতীত দৃষ্টির সাহায্যে সেই বিরাট দুঃখের বিরাট চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—আমরা অযোগ্য হইলেও আমাদের জন্য তাঁহারা অবিনশ্বর তুলিকায় সে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। আইস দেখি সে ছবি কেমন?

সে এক অপূর্ব্ব নারী মূর্ত্তি—সাধক তাঁহাকে ধ্যানে দেখিয়াছিলেন। ত্রিভুবনের যাবতীয় সুন্দর বস্তু হইতে

যেমন তিল তিল সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া দেব সুন্দরী তিলোত্তমার সৃষ্টি—সে নারীরও তেমনি পদনখর হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত দুঃখে গড়া—তাঁর বেদনাময় চরণ, বেদনাময় কর, ব্যথা-ভরা ব্রহ্মাণ্ডজোড়াবুক। সাধক তাঁহাকে ভাবের ঘোরে অনন্ত পুরাইয়া অনন্ত মাতাইয়া মা বলিয়া ডাকেন। বিশ্বের দুঃখে দ্রবময়ী সে মায়ের আলুলায়িত কেশ, বিগলিত বেশ —তাঁর অঙ্গে অঙ্গে, তিলে তিলে নয়, পুঞ্জে পুঞ্জে রাশিতে রাশিতে সমুদয় জগতের সমগ্র বেদনার একত্র সমাবেশ। তাই তিনি মসি-বর্ণা—সাধকের বড় সাধের কাল মেয়ে কালী। সাধক তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে পান নাই—গোলকে দেখেন নাই—দেখিয়াছিলেন দুঃখের লীলা নিকেতন শ্মশানে—দুঃখের সঙ্গিনী ভূতযোগিনীর সনে। যখন মনে হয় সব ফুরাইল--মুষ্টিমেয় ভস্ম এবং কয়েক খণ্ডঅস্থি মাত্র অবশেষ রাখিয়া—আশা আকাঙ্ক্ষার আধার জীব শূন্যে লীন হইল—তখন সাধক দেখেন সেই উপেক্ষিত অস্থি—সেই অনাদৃত ভস্ম একজন অতি সমাদরে সংগ্রহ করিতে-ছেন—শ্মশানের ধূলিতে তাঁর রাঙা পা ধূসরিত। সেই অস্থির হার গাঁথিয়া তিনি বক্ষে ধারণ করেন—সেই ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তিনি অন্তরের জ্বালা জুড়ান। এত যাঁর মমতা তাঁর জীব নাকি আবার লোপ পায়? মায়ের অঙ্কে

উঠিয়া দুঃখের কি অপরূপ রূপ ফুটিয়াছে বল দেখি? এদুঃখ যদি পতিতপাবন না হয়—তবে পতিতপাবন কাহাকে বলে জানি না। ইহাই তন্ত্রকারের ধ্যানলব্ধ দুঃখের প্রতিমা। এই দুঃখরূপিণীকেই তিনি অজ্ঞা, অসংখ্য প্রজার জননী এবং ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা শুধু কবি কল্পনা নহে—এ নির্দ্দেশের গুরুত্ব যে কত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কর্ম্মবাদীর নিকট শুনিয়া থাকিবে বিশ্বের কর্ম্মেই উৎপত্তি—কর্ম্মেই স্থিতি—কর্ম্মেই লয়—অনাদি কর্ম্ম প্রবাহ অনন্তকাল প্রবাহিত বিশ্ব তাহাতেই একবার উঠিতেছে একবার ডুবিতেছে। সাংখ্যকারও বুঝাইয়াছেন—সমস্তই প্রকৃতির কার্য্য—অণু হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সবই এক অব্যক্তের বিকার—তিনিই ভোগ-মোক্ষ-বিধায়িনী। আবার বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকের মুখে শুনি :—

"জগচ্চিত্রং স্বচৈতন্যে পটে চিত্রমিবার্পিতং মায়য়া"

জগৎ মায়ার লীলা, ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালবৎ এক অনির্ব্বাচ্য বস্তুর খেলামাত্র। তান্ত্রিক সাধক তাঁর জননী মূর্ত্তিতে দুঃখের আকারে এই বেদান্তের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি এবং কর্ম্মবাদীর কর্ম্মের পূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁর সেই ব্যথাময়ীকেই ব্রহ্মের অঙ্কশোভিনী আনন্দময়ী বলিয়া অর্চ্চনা করেন।

বাস্তবিক সমগ্র তন্ত্রই জীবনিস্তারার্থ এই মায়ের অলৌকিক উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। তন্ত্রের যে স্থান ইচ্ছা খোল দেখিবে—মা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছেন বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, চ্ছেদ নাই। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা সুরধুনীর ন্যায় তন্ত্রকে মাতৃহৃদয়োত্থ সমবেদনার এক নিরবচ্ছিন্নধারা বলিলেও হয়। জীবের জন্য এত ব্যাকুলতা এত সহানুভূতি এত ভাবনা আর কোথাও মিলে কিনা সন্দেহ—মিলিবার কথাও নয়। মহেশ্বরী প্রশ্ন করিতেছেন উত্তর দিতেছেন স্বয়ং সদাশিব। এই প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে মহেশ্বর একস্থলে বলিয়াছেন ;—

"কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি ॥
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্।"

'সাধিয়া বিশ্বের হিত তোষ বিশ্বাত্মায়'—হিতের দ্বারা অহিতের অর্চ্চনা করিতে হয়—সুখের উপচারে দুঃখের পূজা করিতে হয়—মঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গলের সেবা করিতে হয়; সর্ব্বমঙ্গলা যে মঙ্গলামঙ্গল উভয়েরই জননী, কোনটীই ত তাঁহার উপেক্ষণীয় নয়। যতদিন দ্বৈত বোধ, যতদিন 'এ আমি হাঁসে কাঁদে ভাবে কত নানা ছাঁদে' ততদিন মঙ্গলামঙ্গলের বিরোধ ঘটাইও না। একের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ করিতে ভুলিও না। দ্বৈত জগতে দুঃখ সুখকে খোঁজ—অমঙ্গল মঙ্গলকে

চায়—অহিত হিতের জন্য ব্যাকুল। সাধক বুঝিয়াছিলেন,

মা বাসনা বিহগীবশে, আসে যায় হৃদাকাশে—
সুখ দুঃখ দুই পক্ষ করিয়া বিস্তার—

তাই তিনি কাহাকেও উপেক্ষা করেন না, কাহাকেও অনাদর করেন না।

সাধনমার্গে চলিতে আরম্ভ কর—আরও কত সংবাদ পাইবে। সে মার্গে স্তরের পর স্তর—সোপানের পর সোপান সাজান আছে—যত পার চলিয়া যাও সে পথের শেষ পাইবে না—যতই অগ্রসর হইবে ততই নব নব স্তর নব নব সোপান আবির্ভূত হইতে থাকিবে। কিন্তু এ পথও যেমন অফুরন্ত মায়ের পাওয়ার বিধানও তেমনি অপূর্ব্ব। লীলাময়ী আপন লীলা আপনি সংবরণ না করিলে, আপনাকে আপনি চিনাইয়া না দিলে, কে তাঁহাকে চিনিতে পারে—কে এ পথের অন্ত পায়? জীবকে তিনি ত অনন্তকাল নির্নিমেষ-নয়নে দেখিতেছেন :—

"ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম
পশ্যন্তি চিন্ময়ী দেবী সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিনী।"

কিন্তু জীবত তাঁহাকে দেখে নাই। তিনি দেখা না দিলে দেখিবেই বা কেমন করিয়া? তিনি নিজের ঘোম্‌টা

নিজে না খুলিলে খুলিবে কে? একজনমাত্র সক্ষম। তিনি ভূতভাবন ভূতপতি। তাঁহারই হাত দিয়া মা নিজের ঘোমটা নিজেই খোলাইয়া সেই অবগুণ্ঠন অপসারণের প্রণালী তাঁহারই মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। উহাই তন্ত্রের কুলাচার।

"জীবঃ প্রকৃতি তত্ত্বঞ্চ দিককালাকাসমেবচ
ক্ষিত্যপ্তেজোবয়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে।"

জীব, প্রকৃতি তত্ত্ব, দিক্, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু—এই সকলের নাম কুল। ইহাকে কুল বলিব কি অকূল বলিব তাহা বুঝিতে পারি না—তবে এ কথা নিশ্চিত যে ইহাই মায়ের ঘোমটা খোলা ছবি—ইহারই অভ্যন্তরে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই নিহিত।

"ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পমেতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ
কুলাচার স এবাদ্যে ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদঃ।"

ব্রহ্মবুদ্ধিতে এই সকলের ভাবনারই নাম কুলাচার। পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা তত্ত্বময়ী কুলেশ্বরীর অর্চ্চনা করিয়া যে দিন সাধক কুলাচারে সিদ্ধ হন সেদিন তাঁহার জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব লাভ হয়। সেদিন তাঁহার সুখের হাট এবং দুঃখের মেলা উভয়েরই অবসান ঘটে এবং মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" সেই অদ্বৈত তত্ত্বে তাঁর দ্বৈতপ্রপঞ্চলীন হইয়া যায়।

সমাপ্ত।

APPENDIX.

DURGA PUJA IN MY BOYHOOD.

I go back to a period in my life when Calcutta was a model town in India. Of course it bore then, as it bears now, and shall bear for evermore the magnificient title of "the City of Palaces." I found Calcutta at that time to consist generally of small brickbuilt houses interspersed with shapeless interminable bustees; of dirty roads and dirtier lanes and bye lanes, in which crows, kites and dogs held high carnival throughout the day over the rotten carcasses of birds, calves, rats and cats and when on dark nights feeble oil-lamps served only to confound travellers and very often to deposit them for hours in bottomless ditches along streets beautifully lined with tatties and latrines whose contents held cordial intercourse with kitchen drains within and well-filled fermenting swers without, and emitted odours which had to be resisted at the risk of suffocation by overstuffing the nostrils with cloth and handker-chief; of cesspools where whole armies might have sunk; of tanks whose green waters mixed with profuse perennial discharges from horses' stables and cowpens severely taxed the

olfactory nerves of bathers; of huts thatched with leaves which caught fire sooner than Kerosine or gunpowder and filled the heavens with lurid glare in spring, summer, autumn and winter; of bazars in which the smell of rotten fish and rotting refuse made marketing something like an act of penance for inexpiable sins. In short, the metropolis of British India was then a choice boulevard of Hell. I had spent 8 months in this boulevard in very agreeable company, consisting of brother, cousin, nephew, 6 or 7 in all. But it was absolutely impossible to live here longer. The great Puja was at hand and we had already passed forty sleepless nights--passed them not in unspeakable agony as 'forty sleepless nights' might seem to imply—but in agony mingled with the pleasure of talking of Durga and her children and the tribute of affection due by us to them--small glass lanterns to be lighted before the Goddess-mother, a good sola hat for brother Kartik and a grand lotus for mother Saraswati. The talk was repeated from night to night—it was the same story over and over again, but always fresh and always charming. And thus after talking away forty days and forty nights we were beginning to feel rather impatient when looking out of a window one morning I espied our old Bagdi Jetai with a

basket under her arms, at the cornor of our street; and light as the lark that has seen the first morning beam I flew into the room where my companions were mumbling over their books. But no sooner come than checked. My father—a grave-looking, stern, orthodox Hindu—was there, my blood ran back into my heart, and the word that was about to escape my lips went, I knew not where. But that word was too dear to be lost. So I quitely sat down and communicated by cunning glances what my mouth had failed to express. They all understood it at once, for we had been eagerly speculating for the past few days abont Bagdi Jetai's arrival as the only event that intervened between our painful residence in the boulevard and free career of gaiety in our village. In two minutes Bagdi Jetai came in and after addressing a most affectionate salutation to my father delivered him a letter. Whereupon the sterm features of the old man were seen to relax and he began to smile and talk with Bagdi Jetai with the heartiness of a child. We remained listening so long as they talked of the potter's progress in making the *pratima* and then slipped out of the room one after another.

The following morning was fixed for our departure. But how was the interval to be pass-

ed? Each minute seemed to be an age and an hour was as long as a century. We got over a portion of the time in packing our goods, or, to speak more like the poor rice-eating Bengali that I am, in making *pootlis* thereof. That done we dug small holes in the ground, caught flies in numbers without number and putting them therein and spreading small bits of thin cloth over the holes to prevent them from flying away went on observing them as they buzzed and jostled. But all this was much too innocent occupation for our time of life and temper. So we began to strike the poor little things sufficiently hard to make them apparently lifeless. We then took them up on the palms of our hands and closing our fingers went on blowing upon them with our mouths closely pressed upon the circular opening formed beween the thumb and forefinger. Life came back to many but not to all. We had not a tear or word of pity for those that reawoke not and were thrown away. We wanted to kill time and felt that that could be best done by killing flies. So we went on repeating the cruel trick till the thickening shadows of evening drew the poor little creatures out of our reach. There is something fiendish in man which makes him most cruel when he is most inclined to be jolly. Man's grand-

est festivals are carnivals of blood. The Christmas and the Moharrum are nothing if not marked by such a slaughter of beast and bird as makes the warm blood freeze and coagulate in the very thought! The world would have been more decent and humane if man had been endowed with less enjoying power.

The appointed morning came. The world seemed lighted up by a thousand suns, mild and bright. The air was soft and sweet. The hum of the great city was no longer heard. The signs of busy life were unmarked and unheeded. The heart was swelling like the sea. We snatched a hasty breakfast and set out under the guidance and guardianship of Bagdi Jetai. We hired a *dinghi*, and in so doing we outwitted the *maji* who had evidently smelt a bargain. He demanded Rs. 3, but we argued that a railway had commenenced working on the other side of the river, and dinghi wallas must be content with smaller fare—excellent political economy, as I now see. We prevailed and the hire was fixed at Re. 1—8 as. We got into the dinghi which at once left the ghat. We hugged each other for very joy, and Bagdi Jetai, after stuffing her mouth with *pan* and tobacco leaf, of which she always carried with her a formidable store, began to tell stories

of the great Puja in our family in times long gone by, when few knew Calcutta, and rich and poor in every village loved and respected each other. We were really charmed to hear the little old woman as she told us with tears in her eyes how my great grandfather had saved her father-in-law, a good honest *chasa* whose memory is still affectionately cherished in our village, during a season of scarcity and how my grandfather had helped her to celebrate a puja, and concluded by blessing us in a half-choked voice, 'do you live for ever and prosper, my Babas'! We were all tears ourselves when she exclaimed as she folded up her pan case, 'there Babas, there is the ghat!' and in a minute we were there. We leaped out of the dinghi, threw down 2 Rs. to the maji and went striaight to the shop of a well known moodi who exclaimed, as soon as he saw us, 'Ah, here are my little Babus, coming home to see the great Puja!' We bought a large quantity of *muri* and ate it up in a trice, because we had not been allowed to touch one grain of that article for eight months in the Elysian boulevard for fear of cholera, diarrhœa, and dysentery. It was now nearly 4 o'clock in the afternoon. We tucked up our clothes, shouldered our sticks and dubbed them bayonets.

We stood two and two with one ahead whom we named our Captain, after the fashion of patrolling parties shortly before seen by us in the streets of Calcutta during the Sepoy Mutiny. The Captain gave the word and the march began. In less than two hours we arrived at a serai or bazar, a distance of seven miles from the Ghat. This was a feat of pedestrianism of which Bengali boys now-a-days seem to be wholly incapable. Mother Durga certainly gave the impulse. But mother Durga gives impulse still. The fact is, pedestrianism in respectable life is now considered to be out of date! The bazar consisted of two long rows of shops on the two sides of the road, which was sufficiently broad but very unclean and rendered doubly offensive by a number of pariah dogs strolling about with unsightly sores on their backs. Each shop consisted of a front shed where goods were kept for sale and three rows of huts behind it, with a rectangular compound in the middle. Behind all this was a pond whose nearest side was one ugly heap of broken pottery and dry plantain leaves on which hungry dogs were sleeping, lounging, and otherwise keeping eternal watch for the remains of travellers' meals. We hired one of these huts, again ate up some pice

worth of *muri*, and wentout to buy our market. We bought some potatoes, some brinjals and some slices of salted *hilsa*. But this last we were not destined to enjoy! The chillum was now careering triumphantly among us, and my cousin R—, who was frying the delicious fish more in his own *hilsa* humour than in the mustard oil supplied by the good shopkeeper, complained of a spider's web in his eyes and asked me to hold over the pot the cherag which as it seemed to one and all of us, was giving but a feeble light from a small crevice high up in the wall. I was then reeling terribly on account of my own vengeful pull at the hooka and the cherag dropped from my hand upon the sweetly singing contents of the frying pot which my cousin at once transferred from the hitherto happy fire to the henceforth happy pond without uttering one word of remonstrance! Do you feel shocked, reader, to hear of so hard a pull at the hooka at so early an age? Well, if you are a Bengali I will only remind you of your own wonderful feats of explosion in early boyhood—excelling anything that could have been done by Guy Fawkes of gunpowder fame—in that part of your school house which you technically called Malir Ghar. But inspite of the

mishap, we ate our self cooked supper with infinite relish, and then fell asleep. An hour or two before break of day Bagdi Jetai woke us, telling us at the same time that she had not slept at all, because that was Puja time and with her dear little Babas in her custody she could not forget that thefts and murders were of common occurrence on high roads and in serais. We thanked her of course in our own national style and resumed our march. At about 8 or 9 o'clock in the morning we arrived in a small village skirting our own and were greeted with a loud and hearty cheer from the owner of a shop who carried on a very brisk business. The shop was already full of men and women—buyers, loangers, workmen, scandel-mongers, ganja-smokers, all. The shopman exclaimed—"Ah, my dear little Babus, I cannot let you pass my humble shop at Puja time and after a whole year without giving you the taste of my puja sweetmeats !'. And a hundred voices at once shouted out—' That cannot be, that cannot be, this is Puja time !" verily that was puja time and we were not in the mood to refuse anything to anybody after hearing such a lusty allusion to sweetmeats. So we sat dawn, ate some sugar plums which tasted very much better than the

finest mewa manufactured in Burra Bazar, and with cart-loads of blessings on our heads left the good man's shop. A few paces more and we were on the border of our own village. Sturdy Ram Chand was working in his fields. No sooner did he see us than he called out to his sister to come out and see who had come. His sister Vilasbaty *alias* Vilesh came out running and kissed us all by touching our chins with her fingers and carrying those fingers to her lips. Grand-mamma kristo moni (of the kaiwvarta caste) who was making dung cakes saw us and ran straight to our house, exclaiming all the way 'O ye happy mothers, come out, for our children have come !' It was an ovation of sweet, rustic affection which filled our eyes with tears of joy. The next moment we were in the large mango orchard behind our house. Our mothers, sisters, aunts, grandmothers, all, all were advancing towards us with open arms and smiling faces. A minute more and we were locked in their embraces. They took us into the house, exclaiming in a voice tremulous with delight —'Mahamayi has come indeed !'

To the *Sadar Bari* we all ran to see Mahamayi. The spacious court-yard was full of workmen, engaged in making sheds, splitting bam-

boos, removing jungle, clearing roads, smoking tobacco. They were all, all goodmen and true, had loved us from our infancy, worked for Mahamayi year after year, and blessed everybody. They broke forth into a deafening chorus of self-gratulation when they saw us and rejoiced all the more as they thought of the extra chillums of tobacco which their endearments led us to purloin from the store room. Our venerable old mistri was busy with his *pratima* in the Puja hall. With the dust of ten miles of road covering our legs like so many geological layers we sat down to make chalk water for him, nor could we possibly think of rice or refreshment until we had slyly extorted from the good-humoured cashier enough to purchase half-a-dozen more eggs than were exactly needed to make dyes for painting the *pratima*. Surely, the good old *mistri* must eat some boiled eggs himself or he would not paint the idols well, thought we.

The great Puja began. The whole village was resounding with the sound of gongs, tom-toms and conch shells. Men, women and children were flying about like flags and festoons. Old and young, rich and poor, all, all began to look alike. Rank lost its pride and poverty rose to rank. Ragged beggary appeared in holiday

attire, was respected and relieved. The sturdy peasantry took to sturdy merry-making. They gathered in interminable files under the broad decorated *Shamiana*, worked like giants, ate like giants, and rejoiced like giants. The venarable old black smith of the village, took his seat in the baitak-khana and with the silver-mounted *hookah* in his hand went on pouring out the charming poetry of the great Puja from the cherished memories of a hundred years. All who came invited or uninvited, were feasted and not a hearth was lighted in the village for three days and three nights except in the house where Durga was worshipped. We boys heard all this, and acted our parts right heroically; we doled out alms to the beggars, ran from house to house inviting men and women to the Puja feast, did half the work of a *ferash* and three-fourths of that of the sweetmeat maker, bribed the tom-tom-wallas with sugar plums, danced and sang and astonished the simple rustic population by reciting 'Alexander and the Robber' and the speech of Brutus over the deadbody of Lucretia, and gained from the gaping crowd the grand and sweet sobriquet of Saheb.

The great Puja was at length over. The storm and intoxication of the heart passed away. But the

spell that Durga had breathed into the village was not to be broken. Feast after feast followed, today in this house, to-morrow in that, untill all the heads of families had enjoyed their turn of festierty. Gradually the merry village began to be denuded of its *Bhadra-lokas*, the poor kotiwallahs whom inexorable Fate soon tore away from their fellow-villagers. But they did not come away until they had, under the mighty spell of the heavenly charmer, effaced many a quarrel and settled many a dispute among humble agriculturists and laaborious artisans. And artisan and agriculturist, therefore, grieved and felt all the more intensely the men who were so necessary to their happiness in life should leave them soon! And then when a month or more had passed away there occured in the village the tragedy of 'the boys departure.' We had to start, at last, for our miserrable boalevard, and every man and woman and girl in that sweet village of ours sighed and sobbed like one consolidated heart! With us the sun-light of their life passed away, but there continued to live in the great village-heart a memory and a name dear enough to maintain and hold together in brotherly union a goodly collection of Lives for a year. That memory was the memory of

universal sympathy in high caste life and that name was Durga !

Who shall despise that name or grudge to spend fortunes for its sake ? But spend not money in nautches and drunken orgies. Spend it as it was spent in my boyhood. Urge not the place of 'injudicious' or 'indiscriminate' charity so indiscreetly taught to you by Europe. Bear in mind that charity may be made to accomplish far nobler objects than the mere relief of physical suffering, and fail not to consider that that is not money misspent which is not spent in strict accordance with what are called 'economic' rules. Our ancestors, who never consulted political economy in making their Puja expenses, served the cause of humanity and national welfare by winning the respect, the affection and the cofidence of their humbler countrymen. And if money can secure these, which means securing national fraternal union, I care not whether 'economic science,' is respected or not in its expenditure. Englishmen want money for money. But we are not Englishmen and there would be both folly and national danger in our adopting the Englishman's view of the social function of money.